ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৬ ও ১০৭ (যুক্ত), ডিসেম্বর ২০২৫
ISSN : 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10607008

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে প্রকৃতি চিত্রণ

কালিদাস ভক্ত*

Abstract: Poets and writers, fascinated by the beauty of nature, have highlighted various aspects of nature in their writings. The close association of nature with literature can be seen since the Vedic era. The great poet Kalidasa, a scholar and playwright, was captivated by the beauty of nature. World-renowned scholars have called him the poet of nature. He wrote two famous epics – Kumarasambhava and Raghuvansha; three dramas– Malavikagnimitra, Abhijanashakuntala and Vikramorvasiya; and two fragmentary poems– Meghaduta and Ritusamhara. In these poems, the discussion of nature is very much seen. However, the depiction of nature in the play Abhijnanashakuntalam, is very captivating and comprehensive. The book was written approximately in the 1st century BC or 1st century AD. Although the book was written 2000 years ago, its various descriptions of nature and environment captivate the reader. All the topics discussed in the play about nature and the environment are of particular need for humans and the environment even in the modern era. Therefore, the article has been written to explore how the immense magnificence of nature and the environment is essential to human life.

মুখ্যশব্দ: মহাকবি কালিদাস, নাটক, প্রকৃতি ও পরিবেশ

ভূমিকা

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকটি মহাকবি কালিদাসের শ্রেষ্ঠতম রচনা। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সকল মনীষী এ নাটক পড়ে বিমুগ্ধ হয়েছেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে মানুষকে কেন্দ্র করে প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে অতি গভীর সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। এখানে মানুষ এবং প্রকৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে রয়েছে। প্রকৃতি ও মানুষের সাথে ঘটেছে নানা মিথস্ক্রিয়া। প্রকৃতির প্রধান অবলম্বন হলো– গাছ-পালা, তরু-লতা, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, আলো-বাতাস, আগুন, মাটি, পানি,

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র-তারা, নদ-নদী, সমুদ্র প্রভৃতি। বেদে এগুলোকে প্রকৃতির চেতনাময় সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে দেবতা জ্ঞানে ও মাতৃরূপে বন্দনা করা হয়েছে। যেমন– সূর্য, অগ্নি, পৃথিবী, সোম, বায়ু, বৃক্ষ, ঊষা, অরণ্যানী প্রভৃতি দেব-দেবীর স্তুতি আমরা প্রত্যক্ষ করি। মহাকবি কালিদাস বেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আলোচ্য নাটকে বিভিন্নভাবে তা প্রত্যক্ষ করা যায়। আদিম যুগে মানুষ বন-জঙ্গলে প্রকৃতির সান্নিধ্যে বসবাস করত। সেযুগ পেরিয়ে আজকে আধুনিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু মানুষ সভ্য হলেও প্রকৃতিকে ক্রমান্বয়ে ধ্বংস করে আসছে। এতেই প্রকৃতি পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধিসহ নানা বিপত্তি দেখা দিয়েছে। তবে মহাকবি কালিদাস খ্রিস্টপূর্ব যুগেই সেটি অনুধাবন করেছিলেন। তিনি গ্রন্থটিতে এমন কিছু বিষয় উপস্থাপন করেছেন যা মানুষ ও পরিবেশের জন্য অত্যন্ত দরকারি। সে সমস্ত বিষয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে প্রকৃতি ও পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টি যথার্থভাবে অনুধাবনের উদ্দেশ্যে বর্তমান প্রবন্ধটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা তুলে ধরা।
- দেশের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে প্রকৃতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা।
- প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বসবাসের গুরুত্ব তুলে ধরা।
- তরুণ প্রজন্মসহ সর্বস্তরের জনগণকে প্রকৃতি পরিবেশের যত্ন ও সুরক্ষার বিষয়ে আহ্বান জানানো।

গবেষণার যৌক্তিকতা

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের মাধ্যমে প্রকৃতি সম্মন্ধীয় বিভিন্ন বিষয় মানুষের জীবনধর্মী করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। নাটকে শুধুমাত্র রাজা দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার প্রেম কাহিনি নয় বরং প্রকৃতি প্রেম বিশেষভাবে বিধৃত হয়েছে। এখানে প্রকৃতিকে মানুষের সুখ-দুঃখের সমান ভাগিদার করা হয়েছে। তাছাড়া প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রকৃতি সচেতনতা, সাহিত্যকর্মের শৈল্পিক দিক এবং অতীতের সাথে সমকালীন প্রকৃতি-পরিবেশের চিন্তা-ভাবনার সেতুবন্ধন অত্যন্ত মসৃণ। এরূপ বিভিন্ন কারণে গবেষণার যৌক্তিকতা প্রমাণ করে।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রস্তাবিত গবেষণাকর্ম সাহিত্য নির্ভর, বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী। আধেয় বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতির মাধ্যমে প্রস্তাবিত বিষয়টি সম্পাদন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক– এ দুই ধরনের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরে প্রকৃতি ও পরিবেশের গুরুত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রত্যাশিত ফল

মহাকবি কালিদাস এই নাটকের মাধ্যমে সেকাল-একালের মানুষকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি প্রকৃতি ও পরিবেশের যে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন তা অনুকরণীয় বিধান। এখানে প্রকৃতি ও মানুষের সাথে যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে নাট্যকার তা অতি মনোরমভাবে তুলে ধরেছেন। নাটকে উল্লিখিত প্রকৃতির বর্ণনা বিশ্বসভ্যতা টিকে থাকার অন্যতম উপায়। বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রকৃতি-পরিবেশ বিষয়ক গৃহীত নানা পদক্ষেপ, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও মানুষকে আন্দোলিত করে সচেতন করার প্রয়াস, প্রকৃতি-পরিবেশের সুরক্ষা, বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ভূমিকা প্রভৃতি শ্লোগানও সুকৌশলে এই নাটকে বিঘোষিত হয়েছে।

তাৎপর্য

নাটকের প্রতিটি ছত্রে নাটকীয় কাহিনি পরিবেশনের পাশাপাশি সুকৌশলে প্রকৃতির নিটোল বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, লতা-পাতা বৃক্ষাদিকেও মানুষের মতো সমধর্মী মনে করে ভালোবাসা ও যত্ন নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সেই সাথে বন্য প্রাণী রক্ষা এবং ভালোবাসা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লিখিত রয়েছে। প্রকৃতি সম্পর্কীত বিভিন্ন তথ্য প্রবন্ধটির তাৎপর্য প্রতীয়মান হয়।

সাহিত্য পর্যালোচনা

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকটির উৎস রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণসহ প্রভৃতি গ্রন্থ। এছাড়া আধুনিক ধারার ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থের যে আলোচিত উপমা, দৃষ্টান্ত ও উক্তির উল্লেখ রয়েছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আকর গ্রন্থ হিসেবে কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকটি প্রাথমিক উৎস হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে প্রকৃতি সম্বন্ধীয় গবেষকদের কর্ম থেকে বিভিন্ন ধারণা নেওয়া হয়েছে।

মনীষীগণ *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটক সম্পর্কে নানা মন্তব্য করেছেন–

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছেন– সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে শকুন্তলা সে সকল অপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট। এই অপূর্ব নাটকের আদি অবধি অন্ত পর্যন্ত সর্বাংশই সর্বাঙ্গ-সুন্দর। যদি শতবার পাঠ কর শতবারই অপূর্ব বোধ হবে।... ধন্য কালিদাস! ধন্য অভিজ্ঞান শকুন্তল! প্রলয়ের পূর্বে তোমাদের বিলয়ের আশঙ্কা নাই। (সত্যনারায়ণ, ২০০৮, পৃ. ৭৭)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাচীন সাহিত্যে *শকুন্তলা* নাটক সম্পর্কে বলেছেন–

> শকুন্তলার মতো এমন প্রশান্ত গম্ভীর, এমন সংযত সম্পূর্ণ নাটক শেক্স্পিয়রের নাট্যাবলীর মধ্যে একখানিও নাই। অভিজ্ঞানশকুন্তলমে মহর্ষি কণ্বের মালিনীতীরবর্তী আশ্রমের রূপ হলো– সেখানে হুত হোমের ধূমে তপোবনতরুর পল্লব-সকল বিবর্ণ, সেখানে জলাশয়ের পথ-সকল মুনিদের সিক্তবল্কলক্ষরিত জলরেখায় অঙ্কিত এবং যেখানে বিশ্বস্ত মৃগসকল রথচক্রধ্বনি ও জ্যানির্ঘোষকে নির্ভয় কৌতূহলের সহিত শুনছে। কিন্তু সেখান থেকে প্রকৃতি দূরে পলায়ন করেনি। সেখানেও কখন রুক্ষ বল্কলের নীচ হতে শকুন্তলার নবযৌবন অলক্ষ্যে উদ্ভিন্ন হয়ে দৃঢ়পিনদ্ধ বন্ধনকে চারি দিক হতে ঠেলতেছিল। সেখানেও বায়ুকম্পিত পল্লবাঙ্গুলি-দ্বারা চুতবৃক্ষ যে সংকেত করে তাহা সাম মন্ত্রের সম্পূর্ণ অনুগত নহে এবং নবকুসুমযৌবনা নবমালিকা সহকারতরুকে বেষ্টন করে প্রিয়মিলনের ঔৎসুক্য প্রচার করে (রবীন্দ্রনাথ, ২০১১, পৃ. ৭১৮)।

সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকের সম্পাদনা প্রসঙ্গে বলেছেন– কালিদাসকে কেন প্রকৃতির কবি বলা হয় তা তাঁর যে কোনো কাব্য নাটক পড়লেই অনুধাবন করা যায়। গ্রন্থসমূহের সর্বত্রই প্রকৃতিপ্রেম, প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের আন্তরিক ঘনিষ্ঠতার অনুভূতির পরিচয় মেলে। (সত্যনারায়ণ, ২০০৮, পৃ. ১৩৯)

পরেশ চন্দ্র মণ্ডল শকুন্তলার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নাটকটির প্রকৃতির চিত্র তুলে ধরেছেন–

> She possesses a generous heart full of affection and tenderness. She is an innocent maiden and quite happy among the plants and vines of the hermitage. Her kind and sympathetic nature shows in her affectionate behaviour even towards the inferior creations in the hermitage.
>
> The trees and shrubs of the hermitage are brothers and sisters to her (na kevalaṃ tātaniyoga eva, asti me sodara-sne-hopyeteṣu - Act I). At the time of her departure she bids farewell to 'vanajyotasnā'; she shows her anxiety for the safe delivery of the female antelope, and weeps for the little fawn (idānīmapi mayā virahitaṃ tvāṃ tāta cintayiṣyti Act IV). (Paresh 1986, p. 222)

নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস বলেছেন–

অভিজ্ঞানশকুন্তলম-এর হৃদয়গ্রাহী নাটকীয় বস্তু কেবল আমাদের নয়ন ও কর্ণের আনন্দবিধায়কই নয়, পাঠক চিত্তের সৌন্দর্যের ভুবনে পরিভ্রমণই নয়, কিংবা মর্ত্যের সজীব প্রাণের সান্নিধ্য নয়, এ নাটক আমাদের হৃদয়ের প্রশান্তি, স্বর্গের অসীম উদার লোকের অনুসন্ধান এবং এ যেন কোনো দর্শনের উন্নত ভুবনের সোপান (নারায়ণ, ১৯৮৫, পৃ. ২৬)।

জ্যোতিভূষণ চাকী *অভিজ্ঞানশকুন্তল*-এর অনুবাদ প্রসঙ্গে বলেছেন–

> মূক প্রকৃতিকে কোন নাটকের ভিতরে যে প্রধান এমন অত্যাবশ্যক স্থান পেতে পারে তা বোধ করি সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না প্রকৃতিকে মানুষ করে তুলে তার মুখে কথাবার্তা বলে রূপকনাট্য রচিত হতে পারে; কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃতি রেখে তাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করে তোলা, তার দ্বারা পাঠকের এত কার্য সাধন করে লওয়া, এ-তো অন্যত্র দেখি নাই (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৫৭)।

বিমান ভট্টাচার্য (২০০৪) বলেছেন– “আমরা প্রকৃতির কবিরূপে কালিদাসের পরিচয় পাই। কবি প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় এবং প্রকৃতিকে প্রকৃতি রেখে মানুষের সমধর্মীরূপে চিত্রিত করে মানুষের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার করেছেন” (পৃ. ৯৭)।

এ পর্যায়ে *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভাবনা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হলো–

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় স্রষ্টার প্রার্থনা–

সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্য-নাটকের শুরুতে নান্দী শ্লোকে (স্তুতি সূচক শ্লোক) স্রষ্টার উদ্দেশে স্তুতি করা হয়। তবে *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকে মহাকবি কালিদাস শুরুতে নান্দী শ্লোকে স্রষ্টার পাশাপাশি প্রকৃতির কথা বলেছেন। সেক্ষেত্রে শিব হলেন অষ্টমূর্তির প্রতিভু। অষ্টমূর্তির মধ্যে রয়েছে পঞ্চভূত। যেমন– ক্ষিতি (মাটি), অপ্ (জল), তেজ (আগুন), মরুৎ (বায়ু), ব্যোম (আকাশ); সেই সাথে চন্দ্র, সূর্য। আর সমস্ত প্রাণীর আধার পৃথিবী। এসকলই প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে একাত্ম হয়ে রয়েছে এবং পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করছে। এই অষ্টমূর্তি দেবতার মূর্তির মতো উক্ত নাটকে বন্দিত হয়েছে। যেমন–

> যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
> যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
> যামাহুঃ সর্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
> প্রত্যাক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ॥ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ১/১)

অর্থাৎ, যে মূর্তি স্রষ্টার প্রথম সৃষ্টি তা হলো– জল, যে মূর্তি শাস্ত্রানুসারে দেবতাদের কাছে হব্য বহন করে– অগ্নি, যে-মূর্তি স্বয়ং হোতা– যজমান, যে মূর্তি দুটি দিন ও রাত দুই কালকে নির্দিষ্ট করে, যেমন– চন্দ্র, সূর্য শব্দগুণ যে মূর্তিতে সমস্ত বিশ্ব ছেয়ে আছে তা হলো– আকাশ, যে মূর্তিকে সমস্ত প্রাণীর উৎস বলা হয়– পৃথিবী, যে-মূর্তির জন্যে সমস্ত জীবেরা প্রাণবান– বায়ু, সেই আটটি মূর্তিতে প্রত্যক্ষভাবে বিরাজিত শিব সকলকে রক্ষা করুন।

গ্রীষ্মকালের বর্ণনা

নাটকের প্রস্তাবনায় মহাকবি কালিদাসের বর্ণনায় সূত্রধার ও নটীর উক্তিতে দেখা যায়, মনোমুগ্ধকর গানের সুরে, তপ্ত ধরণীতে রমণীয় জলকেলি উৎসবে, সুশোভিত পাট ফুলের ঘ্রাণে, মৌমাছির মধুরেণু গ্রহণকালে ভ্রমরের গুঞ্জনে চিত্রপটে আঁকা ছবির মতো গ্রীষ্মকালের প্রকৃতি বড়ই আমোদিত। এমনি মায়াময়-ছায়াময় প্রাকৃতিক পরিবেশে সহজেই ঘুম এসে যায়। ভ্রমরেরা ফুলে ফুলে চুম্বন করছে, সুন্দরী বালিকারা ফুল তুলে অলংকার পড়ছে। যেমন–

সুভগসলিলাবগাহাঃ পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতাঃ।
প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ॥
ঈষদীষচ্চুম্বিতানি ভ্রমরৈঃ সুকুমারকেশরশিখানি।
অবতংসয়ন্তি দয়মানাঃ প্রমদাঃ শিরীষকুসুমানি॥ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ১/৩-৪)

অর্থাৎ, চমৎকার উপভোগ্য এই গ্রীষ্মকালে দর্শকমণ্ডলীর কাছে শ্রুতিসুখকর কিছু পরিবেশন করা ছাড়া আর কি করার আছে! তাই অবশ্যই ঋতুকে অবলম্বন করে গান আরম্ভ করো। এই সময়ে দিনের শেষ সময় খুবই রমণীয়, জলে অবগাহন করা খুবই আনন্দদায়ক, মৃদুমন্দ বাতাস পাটফুলের গন্ধে সুরভিত, ঘন ছায়ায় অতি দ্রুত ঘুম এসে যায়। মৌমাছিরা চুম্বন করে যায় এমন কোমল পরাগ মাখা শিরীষ ফুলগুলোকে। একই সাথে সুন্দরী ললনারা অলংকার পড়বার মানসে কোমল হাতে ফুলগুলো কানে পরে নিচ্ছে।

তপোবনের প্রাণীদের বর্ণনা

মহাকবি কালিদাস তপোবনের প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনার পাশাপাশি তপোবনের প্রাণীদের সম্পর্কে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। বাল্মীকির রামায়ণে যেভাবে রামচন্দ্রকে মায়া হরিণ গহীন বনে নিয়ে গেছে, তেমনি এখানে দুষ্যন্তকে তপোবনের দুরন্ত-দুর্বার গতির হরিণ অনেক দূরে নিয়ে গিয়েছে। প্রথম অঙ্কে প্রস্তাবনার পরে সূত্রধার ও রাজার উক্তিতে এমনি মায়াবি হরিণের চঞ্চলতার বর্ণনা রয়েছে। যেমন–

তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ।
এষ রাজেব দুষ্যন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা ॥
সুতে দূরমমুনা সারঙ্গেণ বয়মাকৃষ্টাঃ।
গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ
পশ্চার্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ ভূয়সা পূর্বকায়ম্।
দর্ভৈরর্ধালীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্ বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্যাং প্রযাতি ॥ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ১/৫,৭)

অর্থাৎ, তপোবনে অতি ধাবমান এই হরিণগুলো যেমন রাজা দুষ্যন্তকেবনের গহীনে নিয়ে গেল, তেমনি গানের মধুময় সারঙ্গ রাগও প্রসঙ্গ থেকে সজোরে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। সারথি! এই সারঙ্গ অনেক দূর আর্কষণ করে এনেছে। সুন্দর ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকিয়ে রথের দিকে চোখ রেখে কেবলই ছুটে চলেছে, বাণ এসে লাগবার ভয়ে শরীরের পিছনের দিকটা অনেকখানি বাঁকিয়ে এনেছে। ক্লান্ত হয়ে মুখ থেকে খসে পড়া আধা চিবানো ঘাসে পথ ছেয়ে গেছে। খুব জোরে-জোরে লাফিয়ে ওঠায় মনে হয় শূন্যেই ভেসে চলছে, মাটিতে চলছে না বললেই হয়। হরিণটিকে অনুসরণ করলেও ধাবমানতার জন্য দৃশ্যহীন লাগছে।

তপোবনের প্রাণীদের রক্ষার আবেদন

প্রথম অঙ্কে দেখা যায়, রাজা দুষ্যন্ত মৃগয়ায় এসে হরিণের দিকে তীর ছুঁড়তে উদ্যত, তখন বন্য প্রাণীদের রক্ষার বিষয় আশ্রমের তপস্বীরা আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা বনের এক-একটি প্রাণী তাঁদের আত্মার আত্মীয়, বন্ধুর মতো। যেমন–

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে তূলরাশাবিবাগ্নিঃ।
ক্ব বত হরিণকানাং জীবিতঞ্চাতিলোলং
ক্ব চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে ॥
তৎ সাধুকৃতসন্ধানং প্রতিসংহর সায়কম্।
আর্তত্রাণায় বঃ শস্ত্রং ন প্রহর্তুমনাগসি ॥ (প্রসুন, ২০১৫ পৃ. ১/১০–১১)

অর্থাৎ, মৃগের কোমল দেহে তীর ছুঁড়বেন না। তীক্ষ্ণ বাণ যেন মৃগ দেহে তুলোর পাজাঁয় আগুন দেবার মতো। কোথায় এই হরিণ শিশুদের নিতান্ত ক্ষণিক জীবন আর কোথায় আপনার বজ্রকঠিন তীক্ষ্ণ বাণ! এখনই বাণ সংবরণ করুন। আর্তদের রক্ষা করবার জন্যেই আপনাদের অস্ত্র, নির্দোষকে আঘাত করবার জন্যে নয়।

পূজার উপকরণ প্রকৃতি থেকে

তপোবন বাসীরা পূজার যজ্ঞীয় নানা উপকরণ প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করতেন। তখনকার দিনে যজ্ঞীয় বিভিন্ন উপকরণ বনে পাওয়া যেত। তা প্রথম অঙ্কের তপস্বীর উক্তিতে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন–

> রম্যাস্তপোধনানাং প্রতিহতবিঘ্নাঃ ক্রিয়াঃ সমবলোক্য।
> জ্ঞাস্যসি কিয়দভুজো মে রক্ষতি মৌর্বীকিণাঙ্ক ইতি ॥ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ১/১৩)

অর্থাৎ, রাজন আমরা পূজার উপকরণ সংগ্রহে বেরিয়েছি। এটি কুলপতি কাশ্যপের মালিনী-তীরবর্তী আশ্রম। আপনি আশ্রমে প্রবেশ করে আতিথেয়তা গ্রহণ করুন। তা ছাড়া, বাধাবিঘ্ন দূর হওয়ায় তপস্বীদের যে যাগযজ্ঞ রম্যরূপে নিয়েছে তা দেখে জানবেন-ধনুর্গুণের আঘাতে চিহ্নিত বহু জন-পালনে কতটা সফল হয়েছেন।

মহর্ষি কণ্বের আশ্রমের প্রকৃতি চিত্রণ

মহাকবি কালিদাসের বর্ণনায় মহর্ষি কণ্বের আশ্রমের এক অনন্য সৌন্দর্যের প্রকাশ পেয়েছে। অত্যন্ত সুশোভিত, সুরভিত মালিনী নদীর তটে অবস্থিত মাঙ্গলিক বিভিন্ন উপকরণে ভরপুর। নির্জনতা আশ্রমের নিত্যসঙ্গী। নাটকের নায়ক দুষ্যন্ত তপোবনের আশ্রম দর্শন করে পুণ্যবান ও পবিত্র হওয়ার কথা বলেছেন। 'পুণ্যাশ্রমদর্শনেন আত্মানং পুনীমহে' (প্রসূন, ১৯৮৩, পৃ. ১৪২) অর্থাৎ, পুণ্যাশ্রম দর্শন করে নিজেদের পবিত্র করি। সেই সাথে আশ্রমের সৌন্দর্য বর্ণনায় রাজার উক্তিতে প্রকৃতির অনাবিল রূপশ্রী প্রকাশিত হয়েছে। যেমন–

> নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
> প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।
> বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা-
> স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিস্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ ॥ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ১/১৪)

অর্থাৎ, তপোবনের শুকপাখিদের কোটর থেকে গাছের নিচে ঝরে পড়ছে নীবার ধান। কোথাও কোথাও মসৃণ তৈলাক্ত পাথরের টুকরোগুলো বলে দিচ্ছে এখানে তপস্বীরা ঈঙ্গুদীফল ভেঙেছেন (প্রাণীদের ক্ষত শুকাতে ঈঙ্গুদী ফল ভেঙেছেন)। কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই, এমন বিশ্বাস থাকায় হরিণেরা ভয়ে দূরে যাচ্ছে না, রথের শব্দ সহ্য করছে। আশ্রমের পথ রেখা পরিহিত বল্কলের জলবিন্দুতে সিক্ত রয়েছে।

এরপরে দেখা যায় রাজা দুষ্যন্ত যখন আশ্রমে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন তখন শান্ত-স্নিগ্ধ প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে তাঁর মনে অপার আনন্দের সৃষ্টি হয়। সেইসাথে প্রকৃতির সান্নিধ্যে আজন্ম, লালিত হওয়া আশ্রম কন্যাদের দেখে নগরের সৌন্দর্যের চেয়ে তপোবনের সৌন্দর্য যে অধিকতর সুন্দর, তা রাজা দুষ্যন্তের উক্তিতে বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন–

শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃকুতঃ ফলমিহাস্য।
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র ॥
শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ ॥ (প্রসুন, ২০১৫, ১/১৫–১৬)

অর্থাৎ, এটি আশ্রমের প্রবেশ পথ। যাই, শান্ত-সুন্দর-মনোরম পরিবেশে প্রবেশ করি। এই আশ্রমের পরিবেশই যেন সমস্ত ভোগের নিবৃত্তির কারণ, কিন্তু আমার বাহু কেন স্পন্দিত হচ্ছে? এখানে এর ফল লাভের সম্ভাবনা কোথায়? তবে ভবিতব্যের দ্বার সর্বত্র উন্মুক্ত। রাজা আশ্রমের চারদিকের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে– এ কি, কুঞ্জের দক্ষিণে যেন আলাপ শোনা যাচ্ছে। তবে ওখানেই যাই। এদিকে দেখছি তপস্বী কন্যারা নিজেদের বহন-ক্ষমতানুযায়ী গাছে জল দেবার জন্য কলসি নিয়ে চারাগাছগুলোর দিকেই আসছে। সত্যি, এঁরা দেখতে কী সুন্দর! আশ্রমবাসী কারো আকৃতি যদি এমন হয় যে, রাজ-অন্তপুরেও দুর্লভ তাহলে বলতে হবে সৌন্দর্যগুণে বনলতা উদ্যান-লতাকে পরাজিত করে দিয়েছে।

পরবর্তীকালে রাজা দুষ্যন্ত মৃগয়ায় আসার কারণে তপোবনের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট হতে চলছে, তাই মহাকবি কালিদাস তপস্বীর উক্তিতে পরিবেশ রক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন– ‘ভো ভোস্তপস্বিনঃ সন্নিহিতাস্তপোবনসত্ত্বরক্ষায়ৈ ভবতঃ। প্রত্যাসন্নঃ কিল মৃগয়াবিহারী পার্থিবো দুষ্যন্তঃ।’ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ১৪৯)

তুরগখুরহতস্তথাহি রেণুর্বিটপবিষক্তজলার্দ্রবল্কলেষু।
পততি পরিণতারুণপ্রকাশঃ শলভসমূহ ইবাশ্রমদ্রুমেষু ॥
তীব্রাঘাতপ্রতিহতস্তরুঃ স্কন্ধলগ্নৈকদন্তঃ।
পাদাকৃষ্টব্রততিবলয়াসঙ্গসঞ্জাতপাশঃ।
মূর্তো বিঘ্নস্তপস ইব নো ভিন্নসারঙ্গযূথো
ধর্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ১/২৯–৩০)

অর্থাৎ, সকলে তপোবন রক্ষার জন্য উপস্থিত হোন। মৃগয়া উৎসাহী রাজা দুষ্যন্ত, আশ্রমের খুব নিকটেই এসে পড়েছেন। সন্ধ্যাকালের অস্তগামী সূর্যের বর্ণিল আলোর ন্যায় রাজার সৈন্যদের

ঘোড়ার খুরে রক্ত রঙের ধুলো উড়ছে। আশ্রমের তরুশাখায় মেলে দেওয়া জলে-ভেজা বল্কলগুলোতে পঙ্গপালের মতো উড়ে এসে পড়ছে সেই ধুলো। তাছাড়া একটি হাতি রথ দেখে ভয় পেয়ে তপস্যার মূর্তিমান বিগ্রহের মতো তপোবনে প্রবেশ করছে। তীব্র আঘাতে একটা গাছের কাণ্ডে তার একটা দাঁত গেঁথে গেছে। পা দিয়ে সে যেসব লতা ছিঁড়ে ছুটছে তা তার গায়ে বলয়ের মতো লেগে আছে, দেখে মনে হচ্ছে সে যেন জালে জড়িয়ে পড়েছে। তাকে দেখে ভয়ে এদিকে-ওদিকে ছুটে পালাচ্ছে হরিণের দল।

দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষকের উক্তিতে আশ্রমের নির্জনতা, স্নিগ্ধ শিলাতল, বৃক্ষের ঘন-গভীর ছায়া যেন চন্দ্রিমার মতো। চিত্তের আরাম পাওয়ার মতো সবকিছু এখানে রয়েছে। যেমন—

কৃতং ভবতা নির্মক্ষিকম্। সাম্প্রতম্ অস্মিন্‌পাদপচ্ছায়াবিরহিতবিতানসনাথে শিলাতলে উপশিতু ভবান্, যাবদহমপি সুখাসীনো ভবামি (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ১৫৩)।

অর্থাৎ, স্থানটি এমন শান্ত যেন মাছিহীন নির্জনতা বিরাজ করছে। এখানে শিলাসনে বসার স্থান। ঘনগভীর গাছের ছায়ায় যেন চাঁদোয়া বিছানো রয়েছে। আমিও মনের আনন্দে বিশ্রাম করি।

অপরদিকে নগর যেখানে অনেক কোলাহলপূর্ণ থাকে, তপোবন যে অনেক নির্জনতার স্থান তা পঞ্চম অঙ্কে শার্ঙ্গরবের উক্তিতে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন—

মহাভাগঃ কামং নরপতিরভিন্নস্থিতিরসৌ
ন কশ্চিদ্বর্ণানামপথমপকৃষ্টোঽপি ভজতে।
তথাপীদং শশ্বৎপরিচিতবিবিক্তেন মনসা
জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৫/১০)

অর্থাৎ, এই ঋদ্ধিমান রাজা কখনও কর্তব্যচ্যুত হননি, নিম্নবর্ণের কোনো মানুষও কুপথে যায়নি। তবু সর্বদা তপোবনে বাস করে নির্জনতার সঙ্গে পরিচিত বলে, এই জনবহুল প্রাসাদ দেখে মনে হচ্ছে চারদিকে যেন আগুন লেগেছে।

আধ্যাত্মিক মার্গে উপনীত হতে পুরুবংশীয়দের শেষ জীবনের কুলধর্ম হলো তপোবনে যাওয়া এবং তপোবনেকে আশ্রয় করে সাধনা করা। কালিদাস তা সপ্তম অঙ্কে রাজা দুষ্যন্তের উক্তিতে বর্ণনা করেছেন—

নিয়তৈকযতিব্রতানি পশ্চাৎ তরুমূলানি গৃহীভবন্তি তোষাম্ ॥ (প্রসুন, ২০১৫, ৭/২০)

অর্থাৎ, তরুমূলেই পুরুবংশীয়দের (দুষ্যন্ত রাজদের) শেষ জীবনে গৃহ হয়ে ওঠে, যেখানে তপশ্চারণের ব্রত (সন্ন্যাস) কঠোরতার সঙ্গে পালিত হয়।

প্রকৃতি ও পরিবেশ সমুন্নত রাখা রাজার দায়িত্ব

বন-বনানী তপোবন রাষ্ট্রের সম্পদ। তাই তপোবন রক্ষায় রাজার দায়িত্ব রয়েছে। সেটি পঞ্চম অঙ্কের শুরুতে রাজা দুষ্যন্তের উক্তিতে প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা তাপসদের দিয়ে শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠালে তখন মহর্ষি কণ্বের বার্তা রাজা অবগত হয়ে অনুমান করে তপোবনের প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করে নিম্নোক্ত স্বগোক্তিটি করেছেন–

কিং তাবদ্ ব্রতিনামুপোঢ়তপসাং বিঘ্নৈস্তপো দূষিতং
ধর্মারণ্যচরেষু কেনচিদুত প্রাণিষ্বসচ্চেষ্টিতম্।
আহোস্বিৎ প্রসবো মমাপচরিতৈর্বিষ্টম্ভিতো বীরুধা-
মিত্যারূঢ়বহুপ্রতর্কমপরিচ্ছেদাকুলং মে মনঃ (প্রসুন, ২০১৫ পৃ. ৫/৯)

অর্থাৎ, তপোবনে মুনিরা তপস্যা আরম্ভ করলে কোনো বাধাবিঘ্নে তা পণ্ড হলো না তো? কেউ কি তপোবনের কোনো প্রাণীর ক্ষতি করেছে? নাকি আমার কোনো কুকর্মের জন্যে লতায় ফুল ফোটা বন্ধ হয়েছে? এইরকম নানা সন্দিগ্ধ চিন্তায় মনকে অস্থির করে তুলেছে অথচ নিশ্চিতভাবে কারণটা নির্ণয়ও করতে পারছি না।

মৃগয়ায় বিতৃষ্ণা

প্রাচীন কালে রাজন্যবর্গ রাজকার্যের ক্লান্তি দূর করার জন্য প্রকৃতির সান্নিধ্যে বন্য পশু-পাখি শিকারে বের হতেন। তেমনি রাজা দুষ্যন্ত মহর্ষি কণ্বের তপোবনে মৃগয়ায় এসেছেন ঠিক কিন্তু প্রকৃতিকে ভালোবেসে মৃগয়ার বিতৃষ্ণার কথা ব্যক্ত করেছেন। বনের বিভিন্ন প্রাণী যেখানে যে অবস্থায় রয়েছে সেগুলোকে বিরক্ত না করা, তাদের স্বাধীন মতো থাকতে দেওয়া এবং শান্তিপ্রিয় তপস্বীদের যাতে সাধনায় বিঘ্ন না হয় সে বিষয়েও রাজা নির্দেশ নিয়েছে। সেইসাথে পশু শিকার ব্যতীত মৃগয়ায় আরও অনেক উপকার আছে, সে সম্পর্কে সেনাপতি ভদ্রসেনের উক্তিতে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন–

ন নময়িতুমধজ্যমস্মি শক্তো
ধনুরিদমাহিতসায়কং মৃগেষু।
সহবসতিমুপেত্য যৈঃ প্রিয়ায়াঃ
কৃত ইব মুগ্ধবিলোকিতোপদেশঃ ॥

অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালনক্রূরপূর্বং
রবিকিরণসহিষ্ণু স্বেদলেশৈরভিন্নম্।
অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্ত্বাদলক্ষ্যং
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্তি ॥
মেদশ্ছেদকৃশোদরং লঘু ভবত্যুত্থানযোগ্যং বপুঃ
সত্ত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।
উৎকর্ষঃ স চ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিদ্ধন্তি লক্ষ্যে চলে
মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্বিনোদঃ কুতঃ ॥
গাহন্তাং মহিষা নিপানসলিলং শৃঙ্গৈর্মুহুস্তাড়িতং
ছায়াবদ্ধকদম্বকং মৃগকুলং রোমন্থমভ্যস্যতু।
বিশ্রব্ধং ক্রিয়তাং বরাহততিভির্মুস্তাক্ষতিঃ পল্বলে।
বিশ্রামং লভতামিদঞ্চ শিথিলজ্যাবন্ধমস্মদ্ধনুঃ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ২/৩–৭)

অর্থাৎ, কাশ্যপ কন্যার কথা মনে পড়ে তার মৃগয়ায় বিতৃষ্ণা জন্মেছে। প্রিয়ার সঙ্গে একস্থানে থেকে হরিণেরা তাঁকে কী করে সুন্দর দৃষ্টিপাত করতে হয় তা শিখিয়েছে, ধনুকে বাণ জুড়েও আমি তাদের উপর ছুড়ঁতে পারিনি। কেবল গুণেই পরিণত হয়েছে। মহারাজ অরণ্যচারী মাতঙ্গের মতো শক্তিসার ধারণ করেছেন। অনবরত ধনুগুণে আকর্ষণ করায় সে দেহের পূর্বভাগ সুদৃঢ় হয়েছে, যা সূর্যের তেজ সইতে পারে। শ্রমে মোটেই ক্লান্ত হয় না! যদিও তা (মৃগয়ার একটানা পরিশ্রমে) একটু ক্ষীণ হয়েছে, তবু বিশালতার দরুণ তা তেমন বোঝাই যাচ্ছে না। মৃগয়ার উপকারিতার বিষয়ে রাজন আপনিই প্রমাণ। যেমন– মৃগয়ার মেদ কমে যাওয়ায় পেটের স্থূলতাও কমে যায়, তাতে শরীর হালকা হয়ে কঠিন কাজের উপযুক্ত হয়। ভয়ে বা ক্রোধে প্রাণীদের কেমন পরিবর্তন আসে তা চোখে পড়ে। ধাবমান বাণ যদি ঠিক লক্ষ্যে গিয়ে পড়ে ধনুর্ধরের গুণপনাই তাতে প্রকাশিত হয়। মৃগয়াকে অনর্থক পাপ বলা হয়, এরকম আনন্দ আর কিসে পাওয়া যায়। সেনাপতি মহাশয়, আমরা আশ্রমের নিকটে আছি। তাই আপনার কথা সমর্থন করতে পারছি না। আজ মহিষেরা শিঙ্ দিয়ে বার বার জল আলোড়িত করে ডোবায় ডুব দিক, ছায়ায় দলবেধে বসে হরিণেরা রোমন্থন অভ্যাস করুক। শুয়োয়েরা নির্ভয়ে পুকুরের পাঁক থেকে ঘাসে মাথা ছিড়ুক। আর গূণ-শিথিল-করা আমার ধনুর্বাণও বিশ্রাম লাভ করুক। তাহলে বন ঘিরে ফেলবার জন্যে যাঁরা আগেই বেরিয়েছেন তাদের নিবৃত্ত করুন।

নায়িকা শকুন্তলা ও সখীদের প্রকৃতির সাথে একাকার হওয়া

প্রথম অঙ্কে দেখা যায় নায়িকা শকুন্তলা ও তাঁর দুই সখী অনসূয়া, প্রিয়ংবদা তপোবনের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরছেন আর প্রকৃতির সাথে যেন কথা বলছেন। বৃক্ষের পত্র-পল্লবে হাত বুলিয়ে আদর করে দিচ্ছেন। তাঁদের মনের কথাগুলো প্রকৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করছেন। যেমন–

শকুন্তলা– এসো বাতেরিতপল্লবাঙ্গুলীভিঃ ত্বরয়তীব মাং কেশরবৃক্ষকঃ। যাবদেনং সম্ভাবয়ামি।

প্রিয়ংবদা– হলা শকুন্তলে, অত্র এব তাবৎ মুহূর্তকং তিষ্ঠ। যাবৎ ত্বয়া উপগতয়া লতাসনাথ ইব অয়ং কেশরবৃক্ষকঃ প্রতিভাতি।

অনসূয়া– হলা শকুন্তলে, ইয়ং স্বয়ং বরবধুঃ সহকারস্য ত্বয়া কৃতনামধেয়া বনজ্যোৎস্নেতি নবমল্লিকা এনাং বিস্মৃতাসি?

শকুন্তলা– তদা আত্মনমপি বিস্মরিষ্যামি। (লতামুপেত্য অবলোক্য চ) হলা রমণীয়ে খলু কালে অস্য লতাপাদপমিথুনস্য ব্যতিকরঃ সংবৃত্তঃ। নবকুসুমযৌবনা বনজ্যোৎস্না, বদ্ধপল্লবতয়া উপভোগক্ষমঃ সহকারঃ।

প্রিয়ংবদা– অনসুয়ে, জানাসি কিং নিমিত্তং শকুন্তলা বনজ্যোৎস্নাম্ অতিমাত্রং প্রেক্ষতে ইতি।

যথা বনজ্যোৎস্না অনুরূপেণ পাদপেন সঙ্গতা অপি নাম এব অহমপি আত্মনঃ অনুরূপং বয়ং লভেয় ইতি (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ১৪৪)।

অর্থাৎ, শকুন্তলা– বাতাসে নড়া-চড়া পল্লবগুলোই বকুলগাছের আঙুল, ঐ আঙুলের সঙ্কেতে বকুলগাছ যেন তাড়াতাড়ি কাছে যেতে বলেছে। তাই ওকে আদর করি।

প্রিয়ংবদা– তুই জানিস শকুন্তলা পাশে এলে মনে হয় বকুল গাছটা যেন কোনো লতার সঙ্গে পরিণীতা।

অনসূয়া– ওলো শকুন্তলা, এই সেই আম গাছের স্বয়ংবর বধূ, নবমল্লিকা, যাকে তুই নাম দিয়েছিস বনজ্যোৎস্না। একে তুই ভুলে গিয়েছিস?

শকুন্তলা– তাহলে আমি নিজেকেও ভুলে যাব। ওলো, বড় ভালো সময়েই এই তরুলতা দুটির মিলন ঘটেছে। নতুন ফুলে বনজ্যোৎস্না যৌবনবতী আর পল্লবযুক্ত হওয়ায় আমগাছটি আরও উপভোগ্য মনে হচ্ছে।

প্রিয়ংবদা– অনসূয়া জানিস, শকুন্তলা বনজ্যোৎস্নাকে খুব বেশি করে দেখছে কেন?– বনজ্যোৎস্না যেমন একটি যোগ্য তরুর সঙ্গে মিলিত হলো তেমনি নিজের মনের মতো বর পাবে কিনা এই ওর চিন্তা।

নায়িকা শকুন্তলার রূপ বর্ণনায় প্রকৃতি চিত্রণ

প্রথম অঙ্কে নায়ক দুষ্যন্তের উক্তিতে শকুন্তলার রূপ যেন শুচি শুভ্র পুত-পবিত্র পদ্মের মতো কমনীয় রূপের প্রকাশ পেয়েছে। নগরের সহজ জীবন থেকে অরণ্যের কঠিন-কঠোর জীবনাচরণ এই ফুলের মতো শকুন্তলার কোমল শরীরের পক্ষে খুবই অসম্ভব ব্যাপার। সেই সাথে প্রকৃতির স্বভাব-সুলভ অলঙ্কার পড়ে তাঁর রূপশ্রী বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সে কথা এখানে নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন–

ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপু-
স্তপঃ ক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবংস নীলোৎপলপত্রধারয়া
শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি ॥
সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবালেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্ ॥
অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ১/১৭–১৯)।

অর্থাৎ, রাজা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে শকুন্তলাকে দেখে মনে মনে ভাবছেন– তপোবনের এই তাপসকন্যা যাকে পূজনীয় কাশ্যপ অবিবেচকের মতো আশ্রমের কাজে নিযুক্ত করেছেন। যিনি এই স্বভাবসুন্দর দেহকে তপস্যার উপযুক্ত করে তুলতে চান তিনি নিশ্চয় নীলপদ্ম পাতার প্রান্ত দিয়ে শমী গাছের লতা ছেদন করতে চেষ্টা করছেন। সত্যি, বল্কল ঠিক তাঁর দেহের উপযুক্ত নয়। তবু তা যে অলঙ্কারের মতো শ্রীবৃদ্ধি করছে না তা নয়। পদ্ম শৈবালযুক্ত হলেও সুন্দরই দেখায়। চাঁদের কলঙ্কচিহ্ন থাকলেও তা তার শোভাই বৃদ্ধি করে। এই ললনাকে বল্কলে আরও মনোহারিণী-রমনীয়া দেখাচ্ছে, যাদের আকৃতি স্বভাবতই সুন্দর কোনো জিনিসই তাদের অলঙ্কার হয় না। শকুন্তলার অধর কিশলয়ের বর্ণে মণ্ডিত, বাহুদুটি কোমল শাখার মতোই, যেন ফুলের মতো লোভনীয় যৌবন তাঁর অঙ্গে অঙ্গে উথলে পড়ছে।

দ্বিতীয় অঙ্কে মহাকবি কালিদাস শকুন্তলার অনুপম রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। বিধাতা যেন নিজ হাতে নিখুঁতভাবে আলপনা একে প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য একত্রিত করে প্রাণ সৃষ্টি করেছেন। সে যেন নতুন এক দেবী মূর্তির অঙ্কিত রূপ। রাজা দুষ্মন্তের উক্তিতে বলা হয়েছে–

অনাঘ্রিতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈ-

রনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ ॥ (প্রসুন, ২০১৫, ২/১০)

অর্থাৎ, আমার মনে হচ্ছে তাঁর অকলঙ্ক এই রূপ যেন একটি ফুলের মতো যার ঘ্রাণ এখনও কেউ নেয়নি, সে যেন এমন একটি পল্লব কোনো আঙুল যাকে ছিঁড়ে নেয়নি, ইনি যেন এমন নতুন-মধু যার রসাস্বাদন এখনও কেউ করেনি। সে যেন এমন পূণ্যের ফল যা এখনও অখণ্ডিত। জানি না এই রূপ ভোগ করবার জন্য বিধাতা কাকে নির্বাচন করবেন।

পরবর্তীকালে মহাকবি কালিদাস রাজা দুষ্যন্তের উক্তিতে প্রকৃতির অনাবিল পরিবেশে বেড়ে ওঠা শকুন্তলার স্বভাব-সুলভ চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন−

ক্ব বয়ং ক্ব পরোক্ষমন্মথো মৃগেশাবৈঃ সমমেধিতো জনঃ।
পরিহাসবিজল্পিতং সখে! পরমার্থেন গৃহ্যতাং বচঃ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ২/১৮)

অর্থাৎ, কোথায় আমাদের নাগরিক জীবন আর কোথায়বা মৃগশিশুর সঙ্গে বেড়ে ওঠা কর্মবিমুখ মানুষ। সখা, আমি যা বলেছি, পরিহাস করেই বলেছি। সত্যি বলে মনে করো না যেন।

তৃতীয় অঙ্কে রাজা দুষ্যন্তের উক্তিতে বিরহ-কাতর শকুন্তলার প্রকৃতির অলঙ্কার পদ্মের বলয় শরীর থেকে খসে পড়তে দেখে এবং গ্রীষ্মকালের তাপের সাথে মদনের তাপ মিলে এক মায়াবী রূপ ফুটে উঠেছে তা নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন−

স্তনন্যস্তোশীরং শিথিলিতমৃণালৈকবলয়ং
প্রিয়ায়াঃ সাবাধং কিমপি কমনীয়ং বপুরিদম্।
সমস্তাপঃ কামং মনসিজনিদাঘপ্রসরয়ো-
র্ন তু গ্রীষ্মস্যৈবং সুভগমপরাদ্ধং যুবতিষু (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৩/৬)

অর্থাৎ, বিরহ বাণে বিদ্ধ স্তনদুটিতে উশীরের (উশীর চন্দন) অনুলেপন দেওয়া হয়েছে। পদ্মের একটি বলয় অঙ্গ থেকে খসে পড়েছে। বিপুল সন্তাপে প্রিয়ার তাপিত দেহ তবুও কত সুন্দর দেখাচ্ছে। কাম ও গ্রীষ্ম− এ দুটির তাপের আধিক্য যদিও সমান বলে মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু যুবতীদের ওপর গ্রীষ্মের প্রকোপ এমন মধুর হয় তা বড়ই বিরল।

পরবর্তীকালে অনসূয়ার কথার উত্তরে রাজা যেভাবে জবাব দিলেন তাতে শকুন্তলা যে তাঁর কাছে বড়ই গৌরবের, শ্রেষ্ঠতর রমণী। তার সম্পর্কে প্রকৃতির অন্যতম অনুসঙ্গ সাগর-ঘেরা পৃথিবীর সাথে তুলনা করে চমৎকার বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। যেমন−

পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্রবসনা চোর্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৩/১৮)

অর্থাৎ, ভদ্রে, বেশি বলে কি হবে– বহুস্ত্রী থাকলেও আমার বংশের দুটি মাত্র গৌরব– একটি সাগর-ঘেরা পৃথিবী, অপরটি আপনাদের এই সখী।

গাছের পরিচর্যা

শকুন্তলা এবং সখী দুজন– অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। সবে মিলে গাছের পরিচর্যা করছেন। তিনজন তাপসকন্যা, সমবয়সী, প্রকৃতির মতো অনাবিল সুন্দর তাঁদের রূপ। তাঁরা বৃক্ষমূলে জলসিঞ্চনে ব্যস্ত রয়েছেন। প্রিয়সখী অনসূয়া একটু রসিকতা করে যে কথা বললেন এবং উত্তরে শকুন্তলা যা বললেন, তাতে প্রকৃতির প্রতি যত্ন ও স্নেহের পরিচয় মেলে। যেমন–

– হলা শকুন্তলে, ত্বত্তোঽপি তাতকাশ্যপস্য ইমে আশ্রমবৃক্ষকাঃ প্রিয়তমা ইতি তর্কয়ামি। যেন নবমল্লিকাকুসুমপেলবাপি ত্বম্ এতেষাম্ আলবালপূরণে নিযুক্তা।

– হলা অনুসূয়ে, ন কেবলং তাতনিয়োগ এব, অস্তি মে সোদরস্নেহঃ অপি এতেষু! ইতি বৃক্ষসেচনং রূপয়তি। (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ১৪৩)

অর্থাৎ, সখী শকুন্তলা, আমাদের পিতা কণ্ব নিশ্চয়ই তোর থেকে আশ্রমের গাছগুলোকে বেশি ভালোবাসেন। কেননা নবমল্লিকা ফুলের মতো নরম তুই, আর তোকে দিয়েই তরুরাজিকে জলসিঞ্চনের দায়িত্ব দিয়েছেন। উত্তরে শকুন্তলা বললেন– সখী অনসূয়া, ঠিক তা নয়। এদের ওপর আমার রয়েছে ভাইয়ের মতো স্নেহ।

পরবর্তীকালে রাজা দুষ্যন্তের উক্তিতে গাছের পরিচর্যার বিষয়ে নিন্মোক্তভাবে প্রমাণ পাওয়া যায়–

স্রস্তাংসাবতিমাত্রলোহিততলৌ বাহূ ঘটোৎক্ষেপণাদ্
অদ্যাপি স্তনবেপথুং জনয়তি শ্বাসঃ প্রমাণাধিকঃ।
স্রস্তং কর্ণশিরীষরোধি বদনে ঘর্মাম্ভসাং জালকং
বন্ধে স্রংসিনি চৈকহস্তযমিতাঃ পর্যাকুলাঃ মূর্ধজাঃ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ১/২৭)

অর্থাৎ, গাছে জল দেবার জন্যই শকুন্তলাকে পরিশ্রান্ত লাগছে। জলের ঘট তুলতে তুলতে হাত দুটোর তালু রক্তবর্ণ হয়েছে, কাঁধদুটো নুয়ে পড়েছে, একটু বেশি রকম শ্বাস নেওয়ায় এখনও

ওঁর স্তনকম্পন হচ্ছে। মুখের ঘামে কানের শিরীষ ফুল দুটোকে আটকে ধরেছে। খোপার বাঁধন খুলে গেলে এক হাতে বাঁধার ফলে চুলগুলো এলোমেলো হয়ে পড়েছে।

নায়িকা শকুন্তলার প্রকৃতি প্রেম

চতুর্থ অঙ্কে নায়িকা শকুন্তলা গাছ-পালা থেকে আরম্ভ করে তপোবনের প্রতিটি জীব-জন্তুর দিকে খেয়াল রাখতেন। তাই পতিগৃহে যাচ্ছেন বলে প্রিয় সখীদের ওপর দায়িত্ব দিয়ে বলেছেন– হলা এষা দ্বয়োর্বাং হস্তে নিক্ষেপঃ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ১৭২) অর্থাৎ, ওদের দায়িত্ব তোদের কাছে সঁপে যাই। এখানে মহর্ষি কণ্বের উক্তিতে শকুন্তলার সাথে তপোবনের প্রতিটি উদ্ভিদ, প্রাণীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা লক্ষ করা যায়। মহাকবি কালিদাস অত্যন্ত নিপুনভাবে তা বর্ণনা করেছেন। যেমন–

> পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
> নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
> আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
> সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্ ॥
> যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং
> তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে।
> শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্ধিতকো জহাতি
> সোঽয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৪/৯, ১৪)

অর্থাৎ, হে তপোবন তরুগণ, তোমরা জলপান না করলে যে আগে জলপান করত না, অলঙ্কারলিপ্সু হয়েও তোমাদের ভালোবেসে যে একটি পল্লবও ছিঁড়ত না, তোমাদের প্রথম ফুল ফোঁটার সময়ে যার আনন্দের সীমা থাকত না, সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাচ্ছে, তোমরা সকলে অনুমোদন করো। হরিণ শিশুটির মুখ কুশাগ্রে ক্ষত হলে ক্ষত শুকোবার জন্যে তুমি ইঙ্গুদী তেলের প্রলেপ দিয়েছ, শ্যামাক ধান্য মুঠোয় করে খাইয়ে যাকে তুমি বড়ো করেছ, তোমার সন্তানের মতো সেই হরিণটি তোমার পথ ছাড়ছে না।

উপমার প্রয়োগে প্রকৃতির চিত্রণ

মহাকবি কালিদাস *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকে উপমার প্রয়োগে প্রকৃতির নানা বিষয় চিত্রিত করেছেন। প্রকৃতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে বৃক্ষাদি-তরু-লতা, ফুল, নদ-নদী, সাগর-পাহাড় প্রভৃতি। প্রকৃতির এসব অনুষঙ্গ দিয়ে নাট্যকার বিভিন্ন উপমা দিয়েছেন। দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষক রাজার সাথে মৃগয়ায় ক্লান্ত হয়ে সরাসরি রাজাকে দোষ না দিয়ে উপমা দিয়ে বলেছেন–

'যৎ বেতসঃ কুব্জলীলাং বিড়ম্বয়তি তৎ কিমাত্মনঃ প্রভাবেণ, ননু নদীবেগস্য'– অর্থাৎ, বেতগাছ যে কুঁজোর ভূমিকায় অভিনয় করে সে কি নিজের ইচ্ছায়, না নদী বেগই তার কারণ। একই অঙ্কে শকুন্তলার জন্ম বৃত্তান্তকে কালিদাস রাজা দুষ্যন্তের উক্তিতে নবমল্লিকা ফুল বৃন্তচ্যুত হয়ে অর্কতরুর ওপরে পতিত হওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। যেমন–

সুরযুবতিসম্ভবং কিল মুনেরপত্যং তদুজ্ঝিতাধিগতম্।
অর্কস্যোপরি শিথিলং চ্যুতমিব নবমালিকাকুসুমম্ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ২/৮)

অর্থাৎ, পুরুবংশে জন্ম এমন কারো মন নিষিদ্ধ কোনো কিছুতে আসক্ত হয় না। মুনিকন্যা হলেও তিনি অপ্সরীর গর্ভজাত। পরে পরিত্যক্ত হলে মুনি তাঁকে পেয়েছেন। তিনি যেন একটি নবমল্লিকা ফুল, বৃন্তচ্যুত হয়ে যা অর্কতরুর ওপরে পড়েছে।

পরবর্তীকালে দৈবারিক রাজা দুষ্যন্তের পরাক্রমকে সাগরের সীমাহীনতা-বিশালতার সাথে তুলনা করেছেন–

নৈতচ্চিত্রং যদয়মুদধিশ্যামসীমাং ধরিত্রী-
মেকঃ কৃৎস্নাং নগরপরিঘপ্রাংশুবাহুর্ভুনক্তি।
আশংসন্তে সমিতিষু সুরাঃ বদ্ধবৈরা হি দৈত্যৈ-
রস্যাধিজ্যে ধনুষি বিজয়ং পৌরুহূতে চ ব্রজ্রে (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ২/১৫)

অর্থাৎ, নগরতোরণের আগলের কত দীর্ঘ তাঁর বাহু ইনি সাগরের শ্যামপ্রান্তবেষ্টিত সমস্ত পৃথিবী একাই শাসন করেন তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। দৈত্যদের সঙ্গে বিরোধ ঘটলে দেবতারা বাণযুক্ত ধনুতে এবং ইন্দ্র বজ্রে একইভাবে বিজয়ের আশা করে থাকেন।

এরপরে রাজা দুষ্যন্তকে তপোবনে থাকা অবস্থায় দেখা যায়, মায়ের আদেশ এসেছে পিণ্ডপালন ব্রত পালনের জন্য রাজধানীতে যাওয়া প্রয়োজন, অপরদিকে নায়িকা শকুন্তলাকে পাওয়ার সুপ্ত বাসনা আবার তাপসদের অনুরোধ রয়েছে রাক্ষস দমন করাও রাজার দায়িত্বের মধ্যে তাই দুষ্যন্ত উভয় সঙ্কটে পড়েছেন। এমতাবস্থায় তাঁর মানসিক অবস্থাকে পাহাড়ি খরস্রোতা নদীর প্রবাহের সাথে মনের তুলনা করা হয়েছে। যেমন–

কৃত্যয়োর্ভিন্নদেশত্বাদ্ দ্বৈধীভবতি মে মনঃ।
পুরঃ প্রতিহতং শৈলে স্রোতঃ স্রোতোবহো যথা (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ২/১৭)

অর্থাৎ, আমি সত্যিই খুব বিচলিত হয়ে পড়েছি। সামনে পাহাড়ের বাঁধা পেলে নদীর স্রোত যেমন দুভাগে ভাগ হয়ে যায়, তেমনি দুটো কাজ দুজায়গায় বলে আমার মনও দুভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

তৃতীয় অঙ্কে শকুন্তলার বিরহকালীন মনের অবস্থাকে গ্রীষ্মের তাপে শুকিয়ে যাওয়া মাধবী লতার সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেমন–

ক্ষামক্ষামকপোলমাননমুরঃ কাঠিন্যমুক্তস্তনং
মধ্যঃ ক্লান্ততরঃ প্রকামবিনতাবংসৌ ছবিঃ পাণ্ডুরা।
শোচ্যা চ প্রিয়দর্শনা চ মদনক্লিষ্টেয়মালক্ষ্যতে
পত্রাণামিব শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতা মাধবী (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৩/৮)

অর্থাৎ, বুকে স্তনদুটির কাঠিন্য হয়েছে শিথিল, কোমরটি দেখছি খুবই ক্ষীণ আর কাঁধদুটি পড়েছে নুয়ে। দেহকান্তি পাণ্ডুর। কামসন্তপ্তা শকুন্তলার অবস্থা একদিকে শোচনীয় অপরদিকে মনোরম, গ্রীষ্মের বায়ুর স্পর্শে পাতার রস শুষে নেওয়ার মাধবী লতার যেমন অবস্থা হয় ঠিক তেমনি।

পরবর্তীকালে দেখা যায়, রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার চেয়েও বেশি বিরহে কাতর হয়েছেন এটি বুঝাতে চেয়েছেন। কেননা দিনে চাঁদ সূর্যের তাপে যতটা দগ্ধ হয় কুমুদিনী ততটা হয়না। তাই একে অপরের এই বিরহকালীন অবস্থাকে মহাকবি প্রকৃতির অন্যতম অনুসঙ্গ দিনে চাঁদ আর কুমুদিনীর সাথে তুলনা করেছেন–

তপতি তনুগাত্রি! মদনস্ত্বামনিশং মাং পুনর্দহত্যেব।
গ্লপয়তি যথা শশাঙ্কং ন তথা হি কুমুদ্বতীং দিবসঃ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৩/১৫)

অর্থাৎ, হে তন্বী, কামদেব তোমাকে শুধু তাপিত করছেন, কিন্তু আমাকে দগ্ধ করছেন। যেমন, দিন চাঁদকে যতটা ম্লান করে কুমুদিনীকে ততটা করে না।

তৃতীয় অঙ্কের শেষে প্রেমিক হিসেবে দুষ্যন্ত কামার্ত হৃদয়ে প্রেয়সী শকুন্তলাকে কাছে পেতে চাইলেন। কিন্তু লাজুক শকুন্তলা বাঁধা দিলেন। তখন রাজা দুষ্যন্ত তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে প্রকৃতিধর্মী উপমার প্রয়োগ করেছেন। যেমন–

অপরিক্ষতকোমলস্য যাবৎ
কুসুমস্যেব নবস্য ষট্পদেন।
অধরস্য পিপাসতা ময়া তে
সদয়ং সুন্দরি! গৃহ্যতে রসোঽস্য (প্রসুন, ২০১৫, ৩/২১)

অর্থাৎ, ভ্রমর যেমন করে নতুন ফুলের মধু আহরণ করে সেইভাবে তৃষ্ণার্ত আমি আগে তোমার অক্ষত কোমল অধরের স্বাদ গ্রহণ করি।

চতুর্থ অঙ্কে দুষ্যন্তের সাথে শকুন্তলার পরিণয়ের বিষয় দৈববাণীর মাধ্যমে জানা যায়। তখন প্রকৃতিধর্মী উপমার সাযুজ্যে উক্ত ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন–

> দুষ্যন্তেনাহিতং তেজো দধানাং ভূতয়ে ভুবঃ।
> অবেহি তনয়াং ব্রহ্মন্নগ্নিগর্ভাং শমীমিব (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৪/৪)

অর্থাৎ, হে ব্রাহ্মণ, অগ্নিগর্ভ শমীতরুর মতো তোমার কন্যা জগতের কল্যাণের জন্যে দুষ্যন্তের তেজ ধারণ করেছে জেনো।

পঞ্চম অঙ্কে রাজা দুষ্যন্তের গুণের মহিমা প্রকাশ করতে প্রকৃতিধর্মী উপমার প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন–

> স্বসুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ
> প্রতিদিনমথবা তে বৃত্তিরেবংবিধৈব।
> অনুভবতি হি মূর্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং
> শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্ ॥
> ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলাগমৈ-
> র্নবাম্বুভির্দূরবিলম্বিনো ঘনাঃ।
> অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ
> স্বভাব এবৈষঃ পরোপকারিণাম্ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৫/৭, ১২)

অর্থাৎ, নিজের সুখে উদাসীন হয়ে আপনি প্রজাদের জন্যে প্রতিদিন ক্লেশ স্বীকার করছেন। অথবা, আপনার বৃত্তিই এইরকম। গাছ মাথায় তীব্র উত্তাপ অনুভব করে, কিন্তু ছায়া দান করে আশ্রিতদের ক্লান্তি দূর করে। অপরদিকে ফল এলেই গাছেরা নুয়ে পড়ে, নতুন জলের ভারে মেঘেরাও হয় নত, সজ্জনেরা সমৃদ্ধিতেও উদ্ধত হয় না। পরোপকারীদের স্বভাবই তো এই।

নায়িকা শকুন্তলার রূপের মহিমা প্রকাশ করতে রাজা দুষ্যন্তের উক্তিতে কালিদাস প্রকৃতিধর্মী উপমার প্রয়োগ করেছেন–

> ইদনুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
> প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্ন বেতি ব্যবসান্।
> ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং
> ন খলু পরিভোক্তুং নৈব শক্নোমি হাতুম্ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৫/১৯)

অর্থাৎ, এই রমণীর অনিন্দ্য রূপশ্রী, তবু আপনা থেকেই এখানে এসেছে। একে আগে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছি, কি করিনি তা বুঝতে পারছি না। প্রভাতে তুষারগর্ভ কুন্দকুসুমকে ভ্রমর যেমন উপভোগও করতে পারে না, ছেড়েও যেতে পারে না, আমিও তেমনি একে গ্রহণ করতেও পারছি না, প্রত্যাখ্যানও করতে পারছি না।

এরপরে দেখা যায়, রাজা দুষ্যন্ত অভিশাপে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছেন। তাই শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছেন। তখন প্রকৃতিধর্মী বিভিন্ন উপমার প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন–

ব্যপদেশমাবিলয়িতুং কিমীহসে জনমিমঞ্চ পাতয়িতুম্।
কুলঙ্কষেব সিন্ধুঃ প্রসন্নমম্ভস্তটতরুং চ ॥
প্রাগন্তরিক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাতম্
অন্যৈর্দ্বিজৈঃ পরভৃতাঃ খলু পোষয়ন্তি (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৫/২১–২২)

অর্থাৎ, তীরভাঙ্গা নদী যেমন নির্মল জলকে নোংরা করে এবং তীরের তরুকে ভূপাতিত করে, আপনিও তেমনি নিজের কুলকে কলঙ্কিত করে আমাকে অধঃপতিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। যাদের বুদ্ধি আছে এমন স্ত্রীলোকদের তো কথাই নেই। কোকিলরা যেমন আকাশে ওড়বার আগেই নিজেদের সন্তানদের অন্য পাখিদের দিয়ে লালন পালন করিয়ে থাকে।

পরবর্তীকালে কালিদাস রাজা দুষ্যন্তের উক্তিতে চাঁদ যেমন কুমুদিনীকে এবং সূর্য পদ্মিনীকে প্রস্ফুটিত করে তেমনি শকুন্তলার মহানুভবতা ও হৃদয়ের সংযম প্রকাশ করতে নিম্নোক্ত উপমার প্রয়োগ করেছেন। যেমন–

কুমুদান্যেব শশাঙ্কঃ সবিতা বোধয়তি পঙ্কজান্যেব।
বশিনাং হি পরপরিগ্রহসংশ্লেষপরাঙ্মুখী বৃত্তিঃ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৫/২৮)

অর্থাৎ, হে তপস্বী! একে কেন প্রবঞ্চনা করছেন? চাঁদ যেমন কুমুদিনীকে এবং সূর্য পদ্মিনীকেই প্রস্ফুটিত করে তেমনি যাঁরা সংযমী পরদারস্পর্শে তাঁদের প্রবৃত্তি থাকে না।

প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা রাজদ্বার থেকে বিফল মনোরথে ফিরে যায়। পরে রাজা দুষ্যন্ত অঙ্গুরীয় দেখে স্মৃতি ফিরে পেয়ে শকুন্তলার জন্য শোক করতে থাকেন। সেই শোককে প্রকাশ করতে নিম্নোক্ত শ্লোকাংশে উপমাসমূহের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন–

অসন্নিবৃত্ত্যৈ তদতীতমেতে মনোরথা নাম তটপ্রপাতাঃ।
স্রোতবহাং পথি নিকামজলামতীত্য জাতঃসখে! প্রণয়বান্ মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ ॥

সংরোপিতেহপ্যাত্মনি ধর্মপত্নী ত্যক্তা ময়া নাম কুলপ্রতিষ্ঠা।
কল্পিষ্যমাণা মহতে ফলায় বসুন্ধরা কাল ইবোপ্তবীজা (প্রসুন, ২০১৫, ৬/১০, পৃ. ১৬, ২৪)

অর্থাৎ, সে যে একেবারেই চলে গিয়েছে, আর ফিরবে না। সে যেন পাড় ভাঙা নদীর ধস মুহূর্তেই বিলীন হলো। আমি যেন প্রবাহমান নদীকে ছেড়ে মরীচিকার অনুরাগী হয়েছি। সময় মতো বীজ বপন করলে পৃথিবী যেমন প্রচুর শস্য সম্ভাবনাময় ভূমিতে পরিণত হয়। আমিও সন্তান সম্ভবা ধর্মপত্নী শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করেছি। এ যেন সময়মতো বীজ বোনা প্রচুর শস্য সম্ভাবনাময় ভূমিকে ধ্বংস করার মতো।

সপ্তম অঙ্কে শকুন্তলা ও দুষ্যন্তের ছেলে সর্বদমন সম্পর্কে বর্ণনায় প্রকৃতিধর্মী উপমার প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন–

প্রলোভ্যবস্তুপ্রণয়প্রসারিতো বিভাতি জালগ্রথিতাঙ্গুলিঃ করঃ।
অলক্ষ্যপত্রান্তরমিদ্ধরাগয়া নবোষসা ভিন্নমিবৈকপঙ্কজাম্ ॥
এবমাশ্রমবিরুদ্ধবৃত্তিনা সংযমঃ কিমিতি জন্মতস্ত্বয়া।
সত্ত্বসংশ্রয়সুখোঽপি দূষ্যতে কৃষ্ণসর্পশিশুনেব চন্দনম্ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৭/১৬, ১৮)

অর্থাৎ, মোহনীয় খেলনা পাবার আশায় লুব্ধ হাত প্রসারিত করেছে, হাতের আঙুলগুলো পরস্পর জলের মতো জড়ানো, দেখে মনে হচ্ছে এ যেন তরুণ ঊষার প্রস্ফুটিত পদ্ম যার পাপড়ির বিভাগগুলো দেখা যাচ্ছে না।

হে মহর্ষিতনয়, শিশু কৃষ্ণসর্প যেমন চন্দনতরুকে দূষিত করে, আশ্রমবিরুদ্ধ আচরণে তেমনি তুমি কেন তোমার সংযমসাধক সত্ত্বগুণান্বিত পিতাকে ব্যথিত করছ।

নায়িকা শকুন্তলা ও রাজা দুষ্যন্তের পুনর্মিলনকে মহাকবি কালিদাস চন্দ্র ও রোহিনীর মিলনের সাথে তুলনা করেছেন। যেমন–

স্মৃতিভিন্নমোহতমসো দিষ্ট্যা প্রমুখে স্থিতাসি মে সুমুখি!
উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণী যোগম্ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৭/২২)

অর্থাৎ, হে প্রিয়ে, একি সৌভাগ্য! স্মৃতি ঘিরে আমার মোহের অন্ধকার দূর হয়েছে। হে সুন্দরী! গ্রহণের পর রোহিণী যেমন মিলিত হওয়ার বাসনায় চন্দ্রের কাছে গমন করে তেমনি তুমি আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছ।

শকুন্তলার সাথে রাজা দুষ্যন্তের মিলনকে মহাকবি কালিদাস প্রকৃতির অন্যতম অনুষঙ্গ বৃক্ষ ও আকাশের মেঘের সাথে তুলনা করেছেন। বৃক্ষে যেমন আগে ফুল তারপর ফল দেখা দেয়, আকাশে যেমন মেঘের পরে বৃষ্টি হয় তেমনি তাঁদের প্রথমে অভিপ্রায়সিদ্ধি, পরে দর্শন লাভ হয়–

> উদেতি পূর্বং কুসুমং ততঃ ফলং, ঘনোদয়ঃ প্রাক্ তদনন্তরং পয়ঃ।
> নিমিত্তনৈমিত্তকয়োরয়ং ক্রমস্তব প্রসাদস্য পুরস্তু সম্পদঃ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৭/৩০)

অর্থাৎ, ভগবন্! প্রথমেই আমার মনের বাসনা পূর্ণ হলো, পরে দর্শনলাভ, আপনার অনুগ্রহ সত্যিই অপূর্ব। কারণ বৃক্ষে আগে ফুল দেখা দেয়, তারপর ফল; আগে মেঘসঞ্চার, তারপর বর্ষণ, নিমিত্ত-নৈমিত্তিকের এই তো ক্রম, কিন্তু আপনার অনুগ্রহের আগেই এ ক্ষেত্রে সম্পদলাভ হলো।

শকুন্তলার শুশ্রূষায় প্রকৃতির ওষধি

তৃতীয় অঙ্কে প্রেম-সন্তপ্ত শকুন্তলা রাজা দুষ্যন্তকে দেখার পর তাঁর প্রতি গভীর প্রণয় সৃষ্টি হয়েছে। রাজা দুষ্যন্তকে ক্ষণিকের জন্য দেখতে না পেরে প্রেমপীড়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। বিরহ নিরাময়ে সখীরা প্রকৃতির ওষধি ব্যবহার করেছেন। সখীরা বেতসকুঞ্জে প্রকৃতির সান্নিধ্যে তাঁকে শুশ্রূষা করার চেষ্টা করছেন। তখন আশ্রমের এক তাপস সখী প্রিয়ংবদাকে দেখে যে প্রশ্ন করল এবং নেপথ্যে যেভাবে শোনা গেল তাতে শকুন্তলার শুশ্রষার জন্য বেনা মূল (কাশ), পদ্ম পাতা, শান্তি জল প্রভৃতি প্রকৃতির ওষধি ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন–

> প্রিয়ংবদে, কস্যেদমুশীরানুলেপনম্ মৃণালবন্তি চ নলিনী পত্রানি নীয়ন্তে। (শ্রুতিমভিনীয়) কিং ব্রবীষি? আতপলংঘনাৎ বলবস্বস্থা শকুন্তলা। তস্যাঃ শরীরনির্বাপণায় ইতি। তর্হি প্রিয়ংবদে, যত্নাদুপচর্যতাম্। সা হি তত্রভবতঃ কুলপতেরুচ্ছ্বসিতম্। অহমপি তাবদ্ বৈতানিকং শান্ত্যুদকম্ অস্যৈ গৌতমীহস্তে বিসর্জয়িষ্যামি (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ১৫৭)।

অর্থাৎ, প্রিয়ংবদা, এই বেনামূলের প্রলেপ এবং ডাঁটাসহ পদ্মপাতা কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছ? উত্তরে বললেন কী বললে? গ্রীষ্মের তাপে শকুন্তলা খুব অসুস্থ বোধ করছেন? তাঁর পরিচর্যা করো। আমিও গৌতমীকে দিয়ে শান্তি জল পাঠাচ্ছি।

বিরহ বর্ণনে প্রকৃতির সাযুজ্য

শকুন্তলা যেমন রাজার জন্য প্রেম-পীড়ায় আক্রান্ত তেমনি রাজাও বিরহে কাতর হয়ে নানা আকুতি প্রকাশ করেছেন। মহাকবি কালিদাস প্রকৃতির নানা সাযুজ্যে রাজা দুষ্যন্তের মনের কথাগুলো উপস্থাপন করেছেন। যেমন–

তব কুসুমশরত্বং শীতরশ্মিত্বমিন্দো-
র্দ্বয়মিদমযথার্থং দৃশ্যতে মদ্বিধেষু।
বিসৃজতি হিমগর্ভৈরগ্নিমিন্দুর্ময়ূখৈ-
স্ত্বমপি কুসুমবাণান্ বজ্রসারীকরোষি ॥
সম্মীলন্তি ন তাবদ্ বন্ধনকোষাস্তয়াবচিতপুষ্পাঃ।
ক্ষীরস্নিগ্ধধাশ্চামী দৃশ্যন্তে কিসলয়চ্ছেদাঃ ॥
(সংস্পর্শং রূপয়িত্বা)– শক্যমরবিন্দসুরভিঃ কণবাহী মালিনীতরঙ্গাণাম্।
অঙ্গৈরনঙ্গতপ্তৈরবিরলমালিঙ্গিতুং পবনঃ ॥
স্মর এব তাপহেতু র্নির্বাপয়িতা স এব মে জাতঃ।
দিবস ইবাভ্রশ্যামস্তপাত্যয়ে জীবলোকস্য ॥
সংদষ্টকুসুমশয়নান্যাশুক্লান্তবিসভঙ্গসুরবীণি ।
গুরুপরিতাপানি ন তে গোত্রাণ্যুপচারমর্হন্তি (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৩/৩–৫, ১০, ১৬)

অর্থাৎ, ভগবান মদনদেব, কামার্তেরা তোমাকে আর চাঁদকে বিশ্বাস করে প্রতারিত হয়ে থাকেন। তোমার পুষ্পবাণ থাকা আর চাঁদের শীতল কিরণ থাকা দুটোই আমার মতো লোকের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। কারণ চাঁদ ঐ হিমকিরণ দিয়েই অগ্নিবর্ষণ করেছেন আর তুমিও তোমার পুষ্পবাণগুলোকে বজ্রের মতো কঠিন করে তুলছ। তন্বী শকুন্তলা কিছুক্ষণ আগেই এই তরুবিথীর পথেই গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কারণ সে যে বৃন্তকোষগুলো থেকে ফুল তুলেছে সেগুলো এখনও সঙ্কুচিত হয়নি এবং সেখান থেকে সে নবকিশলয় ছিন্ন করেছে সেই জায়গাগুলোও রসেভেজা দেখছি। মিষ্টি হাওয়ার জায়গাটা সত্যিই সুন্দর। মালিনী নদীর তরঙ্গকণাবাহী পদ্মগন্ধি এই বায়ুকে কামতপ্ত দেহে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করতে পারা যায়। এই বেতস লতায় ঘেরা নিকুঞ্জের প্রবেশদ্বারে পাণ্ডুবর্ণ বালির ওপরে নতুন পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে, যার আগের দিকটা উঁচু আর পিছনের দিকটা নিতম্বের ভারবশত গভীর। যাক, ডালপালা দিয়ে দেখি। কী আশ্চর্য! নয়নের পরম শান্তিকে পেয়ে গেছি। আমার প্রাণ প্রিয়তমা দেখছি ফুল বিছানো পাথরের ফলকে শুয়ে আছে, দুই সখী তার পরিচর্যা করছে। যাক, এখন শুনি এদের মন-খোলা কথা। যা শোনার শুনলাম। গ্রীষ্মের শেষে মেঘাচ্ছন্ন দিন যেমন জীবলোকের তাপের কারণ হয়ে আবার সুখের কারণ হয়, কামদেবও তেমনি আমার সন্তাপের কারণ হয়েছিলেন, কিন্তু তিনিই আবার দূর করলেন। পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই। তোমার অঙ্গ অত্যন্ত বেদনায় কাতর, তা কেবল তোমার পুষ্পশয্যায় সংলগ্ন হয়েছে এবং মৃণাল বলয়গুলোকে পিষ্ট করেছে, ও অঙ্গ এখন লোকাচার পালনের যোগ্য নয়।

পিতৃগৃহে আজন্মে লালিত শকুন্তলা জগতের নিয়মানুসারে স্বামীর গৃহে যাচ্ছে। তাঁকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মহর্ষি কণ্ব শিষ্যদের নির্দেশ দিয়েছেন। শিষ্য শার্ঙ্গরব রাত্রির মধ্য প্রহরে জেগে

উদ্বেগ প্রকাশ করছেন, যেটি মানব জীবনের বাস্তব অবস্থানান্তরের কথা প্রকৃতির অন্যতম অনুসঙ্গ চন্দ্র, সূর্য, পর্বত প্রভৃতি জীব জগতের নানা বস্তুর পরিবর্তনের মাধ্যমে মহাকবি কালিদাস প্রকাশ করেছেন। যেমন–

যাত্যেকতোস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্
আবিষ্কৃতোরুণপুরঃসর একতোর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকো নিম্যত ইবাত্মদশান্তরেষু ॥
অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতী মে
দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয়শোভা
ইষ্টপ্রবাসজনিতান্যবলাজনস্য
দুঃখানি নূনমতিমাত্রসুদুঃসহানি (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৪/২–৩)

অর্থাৎ, পূজনীয় কাশ্যপ মুনি আমাকে সময় নিরূপণের আদেশ দিয়েছেন। বাইরে বেরিয়ে দেখি রাতের আর কত বাকি। দেখছি ওষধিপতি চাঁদ এক দিকে অস্ত যাচ্ছে, আর অন্য দিকে সূর্যদেব অরুণকে সামনে নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছেন। তেজোময় এই দুটি বস্তুর উদয়াস্ত লোককে এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে জীবনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবেই। আবার, চাঁদ অস্ত যাওয়াতে কুমুদিনীকে দেখেও আর চোখের তৃপ্তি নেই, তার শোভা এখন স্মৃতির বিষয়। প্রিয়-বিচ্ছেদজনিত অবলার দুঃখ সত্যিই অত্যন্ত দুঃসহ। ঊষা বদরীপত্রের ওপরে সঞ্চিত শিশিরবিন্দুকে রঞ্জিত করেছে। ঘুম থেকে ওঠা ময়ূর কুশতৃণে তৈরি কুটিরের চাল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আর এই হরিণটি খুরের আঁচড়-লাগা বেদীপ্রান্ত থেকে উঠছে, শরীরটাকে টান করায় তার পিছন দিকটা উঁচু হয়ে উঠছে। আর, অন্ধকার দূর করে যিনি পর্বতরাজ সুমেরুর শিরে কিরণ ছড়িয়ে বিষ্ণুর মধ্যম ধামটি (আকাশ) অধিকার করেছিলেন এখন তিনি (চন্দ্র) ক্ষীণরশ্মি হয়ে আকাশ থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছেন, যাঁরা মহৎ তাঁদের জীবনেও উত্থান-পতন অবশ্যম্ভাবী।

বিরহ নিরাময়ে প্রকৃতি অনুসঙ্গ

প্রেম সন্তাপে যখন শকুন্তলার শরীর-মন তাপিত তখন রাজা সেবক হিসেবে তাঁর দুঃখ লাঘব করার জন্য প্রকৃতির উপকরণ দিয়ে পরিচর্যা করে শীতল করে দিলেন। যেমন–

কিং শীতলৈঃ ক্লমবিনোদিভিরার্দ্রবাতান্
সঞ্চারয়ামি নলিনীদলতালবৃন্তৈঃ।
অঙ্কে নিধায় করভোরু! যথাসুখং তে
সংবাহয়ামি চরণাবুত পদ্মতাম্রৌ ॥

উৎসৃজ্য কুসুমশয়নং নলিনীদলকল্পিতস্তনাবরণম্।
কথামাতপে গমিষ্যসি পরিবাধাপেলবৈরঙ্গৈঃ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৩/১৯–২০)

অর্থাৎ, হে করভোরু, ক্লান্তিহারা জলবিন্দুতে যার বায়ু শীতল সেই পদ্মপাতার পাখায় হাওয়া দেব? না তোমার পদ্মরাঙা চরণদুটি কোলে নিয়ে যেভাবে তোমায় ভালো লাগে সেই ভাবে পরিচর্যা করব। সুন্দরী! এখনও দিন শেষ হতে বাকি, তোমার শরীরের এই অবস্থা। যে পুষ্পশয্যা ও পদ্মপাতা তোমার স্তনের আবরণ করে রাখে, তা ত্যাগ করে বেদনা-কাতর এই কোমল অঙ্গ নিয়ে রোদে যাবে কেন?

পরবর্তীকালে শকুন্তলার দুঃখ নিরাময়ের জন্য গৌতমী যখন কুশজল নিয়ে বেতস কুঞ্জে গেলেন। সেখানে তিনি কিছুক্ষণ শুশ্রূষা করে তাঁকে নিয়ে আশ্রমে চলে গেলেন। ঐ সময় রাজা লুকিয়ে থেকে গৌতমীর চোখের আড়ালে গেলেন। শকুন্তলা চলে যাওয়ার পর বিরহ লাঘবের জন্য আবার প্রিয়তমার স্মৃতি রোমন্থনের জন্য বেতস কুঞ্জে গিয়ে তাঁর রেখে যাওয়া প্রকৃতির আবেশে মাখানো নানা স্মৃতি দেখতে পেলেন। যেমন–

তস্যাঃ পুষ্পময়ী শরীরলুলিতা শয্যা শিলায়ামিয়ং
ক্লান্তো মন্মথলেখ এষ নলিনীপত্রে নখৈরর্পিতঃ ।
হস্তাদ্ ভ্রষ্টমিদং বিসাভরণমিত্যাসজ্যমনেক্ষণো
নির্গন্তুং সহসা ন বেতসগৃহাচ্ছক্নোমি শূন্যোদপি (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৩/২৪)

অর্থাৎ, এই শিলা খণ্ডের ওপর শকুন্তলার দেহপিষ্ট ফুলশয্যা রয়েছে। নখ দিয়ে পদ্মপাতায় লেখা মলিন প্রেমপত্রটি দেখা যাচ্ছে। শকুন্তলার হাত থেকে খসে পড়া মৃনাল-বলয়ও তো আছে দেখছি। এসব জিনিসে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ায় এই বেতস-গৃহ শূন্য হলেও এখান থেকে হঠাৎ চলে যেতে পারছি না।

পতিগৃহে যাত্রাকালে প্রকৃতির সাহচর্য

মহর্ষি কণ্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রাণাধিক প্রিয় শকুন্তলাকে স্বামী গৃহে প্রেরণ করবেন। এই সংবাদ শুনে তাঁর প্রিয় মিত্ররা সাধ্য মতো প্রকৃতি থেকে নানা উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। শকুন্তলা গাছ-পালা, ফুল-ফল-তরু-লতারাজির কাছ থেকে অত্যন্ত আবেগঘণ পরিবেশে বিদায় নিচ্ছেন। তাই যাত্রাকালে প্রকৃতির নানা সাহচর্যের বিষয় মহাকবি কালিদাস মহর্ষি কণ্ব, সখী অনসূয়া, প্রিয়ংবদা এবং তাপসদের উক্তির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। সখী অনসূয়া শকুন্তলার জন্য বকুল ফুল সংগ্রহ

করে মালা তৈরি করেছেন এবং বেশি দিন সংরক্ষণের জন্য নারিকেলে ঝাঁপি তৈরি করে দিয়েছেন। এছাড়া মাঙ্গলিক বিভিন্ন উপকরণ প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করেছেন। যেমন–

> তেন হি এতস্মিংশ্চুতশাখাবলম্বিতে নারিকেরসমুদ্গকে এতন্নিমিত্তমেব কালান্তরক্ষমা নিক্ষিপ্তা ময়া কেশরমালিকা। তদিমাং হস্তসন্নিহিতাং কুরু। যাবৎ অহমপি তস্যৈ গোরোচনা-তীর্থমৃত্তিকা দুর্বাকিসলয়ানি ইতি মঙ্গলসমালম্ভানি বিরচয়ামি (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ১৬৮)।

অর্থাৎ, সখী প্রিয়ংবদা, শকুন্তলাকে দেওয়ার জন্য একটা কাজ করো, আম গাছের শাখায় ঝোলানো নারিকেলের ঝাঁপিটায় বেশ কিছুদিন সতেজ থাকবে বিধায় বকুলফুলের মালা গেঁথে রেখেছি। ওটা নিয়ে আয়। আর মঙ্গলসজ্জার জন্য গোরোচনা, তীর্থের মাটি, দুর্বার শিস– এইসকল আয়োজন করি।

পরে দেখা যায়, পতিগৃহে যাবেন বলে শকুন্তলা সূর্যোদয়ের সাথে সাথে প্রকৃতির সান্নিধ্যে মালিনী নদী থেকে স্নান করে এসেছেন। তাপসেরা নীবার ধান দিয়ে আশীর্বাদ করছেন। প্রিয়ংবদার উক্তিতে–

> এষা সূর্যোদয়ে এব শিখাসজ্জিত প্রতীষ্ট-নীরারহস্তাভিঃ স্বস্তিবাচ-নিকাভিঃ তাপসীভিঃ অভিনন্দ্যমানা তিষ্ঠতি শকুন্তলা।

অর্থাৎ, এর পরে শকুন্তলাকে সাজাবার জন্য কণ্ব মুনি প্রকৃতি থেকে অলংকার সংগ্রহের আদেশ দিয়েছেন। আশ্রমের সকল সদস্য প্রকৃতি নানা অলংকার দিয়ে শকুন্তলাকে সাজানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বনের বৃক্ষরাজি অকৃত্রিম হস্তে অলংকারসমূহ দান করেছেন। ঋষিকুমারের উক্তিতে নিম্নোক্তভাবে–

> ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডু তরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতং
> নিষ্ঠ্যূতশ্চরণোপভোগসুলভো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ।
> অন্যেভ্যো বনদেবতাকরতলৈরাপর্বভাগোত্থিতৈ-
> র্দত্তান্যাভরণানি তৎকিসলয়োদ্ভেদপ্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৪/৫)

অর্থাৎ, একটি গাছ দিল চাঁদের মতো সাদা মাঙ্গলিক এই রেশমি কাপড়, আর একটি গাছ দিল পা-দুটি রাঙানোর মতো আলতা, অন্য গাছগুলো বন-দেবতাদের হাত দিয়ে আমাদের দিল এই অলঙ্কারগুলো। তাদের মণিবন্ধ পর্যন্ত বাড়ানো হাতের তালুগুলো নবকিশলয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী।

শকুন্তলা পতিগৃহে যাবেন বলে মাঙ্গলিক প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। কুশ বিস্তীর্ণ যজ্ঞীয় বেদীতে ধুপ-ধুনোর গন্ধে নান্দনিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে করে সকল অশুভ শক্তি বিদূরিত হয়। তাই মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে যজ্ঞীয় বেদী প্রদক্ষিণ করে যাত্রা করতে বললেন–

অমী বেদিং পরিতঃ ক্লৃপ্তধিষ্ণ্যাঃ
সমিদ্বন্তঃ প্রান্তসংস্তীর্ণদর্ভাঃ।
অপঘ্নন্তো দুরিতং হব্যগন্ধৈ-
র্বৈতানাস্তাং বহ্নয়ঃ পাবয়ন্তু (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৪/৮)

অর্থাৎ, বৎসে শকুন্তলা, সমিধযুক্ত অগ্নি বেদীর স্থান নির্দিষ্ট, যার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করো, যার প্রান্তে কুশ বিস্তীর্ণ, হোম গন্ধে সমস্ত পাপ নাশ হয়, সেই যজ্ঞীয় অগ্নি তোমাকে পবিত্র করুক। মহর্ষি কণ্ব আশ্রমের তরু-লতাদির কাছ থেকে শকুন্তলার বিদায়ের অনুমতি চাওয়ার পর কোকিলের কুহুকুহু রবের মাধ্যমে সেটি ধ্বনিত হলো–

অনুমতগমনা শকুন্তলা
তরুভিরিয়ং বনবাসবন্ধুভিঃ।
পরভৃতবিরুতং কলং যথা
প্রতিবচনীকৃতমেভিরীদৃশম (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৪/১০)

অর্থাৎ, শকুন্তলার আরণ্যবাসের বন্ধু গাছেরা তাকে (প্রস্থানের) অনুমতি দিয়েছে, কোকিলের মধুর রবকেই তারা তাদের প্রত্যুত্তর হিসেবে ব্যবহার করছে।

পথ মাঝে রোদের তাপে শকুন্তলা ক্লান্ত হবে তাই যাত্রাপথ আরামদায়ক করার জন্য পদ্মপাতায় শ্যামল সরোবরের পাড়ে তরু-লতার ছায়ায় বিশ্রাম নেবে, তা মহর্ষি কণ্ব বলে দিয়েছেন। যেমন–

রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভিঃ
ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্ক ময়ূখতাপঃ।
ভূয়াৎ কুশেশয়রজোমৃদ্রেণুরস্যাঃ
শান্তানুকুলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৪/১১)

অর্থাৎ, শকুন্তলার যাত্রা পথে পড়বে পদ্মপাতায় শ্যামল সরোবর, যেখানে রোদের তাপছায়া প্রশমিত হবে। সে পথ হোক শুভ, সে পথের ধুলো হোক পদ্ম-পরাগের মতো, তার বাতাস হোক শান্ত সুখকর।

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে পশু-পাখি-বৃক্ষরাজিরাও যেন দুঃখ পেয়ে চোখের জল ফেলছে। তপোবনে কণ্ব মুনি, সখীদ্বয়, তাপসদের পাশাপাশি পরিবেশের অন্যান্যরাও যে সুখ-দুঃখের সমান ভাগিদার হতে পারে মহাকবি কালিদাস তা প্রিয়ংবদার উক্তিতে ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

উদ্গলিদর্ভকবলা মৃগ্যঃ পরিত্যক্তনর্তনা ময়ূরাঃ।
অপসৃতপাণ্ডুপত্রা মুঞ্চন্ত্যাশ্রূণীব লতাঃ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৪/১২)

অর্থাৎ, তুই ই যে তপোবনবিরহে কাতর হয়েছিস তা নয়। তোর আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনায় তপোবনের কী অবস্থা হয়েছে দেখ্। হরিণের মুখ থেকে ঘাসের গ্রাস খসে পড়ছে, ময়ূরেরা আর নাচছে না, শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে, দেখে মনে হচ্ছে লতারা যেন চোখের জল ফেলছে।

শকুন্তলা যেমন রাজা দুষ্যন্তকে পতি হিসেবে বরণ করেছেন তেমনি কণ্ব মুনি প্রকৃতির তরু-লতা নবমল্লিকা ও আম্রতরুকে পাশাপাশি দেখে সেগুলোরও যে পরিণয় হয়েছে বলে ব্যক্ত করেছেন। এভাবে প্রকৃতির মিলনাত্মক বিষয় মহাকবি চমৎকারভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন–

সঙ্কল্পিতং প্রথমমেব ময়া তবার্থে
ভর্তারমাত্মসদৃশং সুকৃতৈর্গতা ত্বম্।
চূতেন সংশ্রিতবতী নবমালিকেয়-
মস্যামহং ত্বয়ি চ সম্প্রতি বীতচিন্তঃ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৪/১৩)

অর্থাৎ, বৎসে, তোমার জন্যে আগেই আমি উপযুক্ত বর মনে মনে চেয়েছিলাম। তোমার পুণ্য ফলেই তুমি তা পেয়েছ। এই নবমল্লিকাও আম্রতরুকে পেয়েছে। এবারে এর জন্যে, আর তোমার জন্য আমার চিন্তা নেই। যাক, এখান থেকেই তুমি যাত্রা শুরু করো।

শকুন্তলা জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত পিতা কণ্বের আশ্রয়ে থেকে পতিগৃহে যাচ্ছেন। নানা স্মৃতি তিনি রেখে যাচ্ছেন। যাত্রাকালে পিতা কণ্বের হৃদয় নানা কারণে ব্যথিত হচ্ছে। তার মধ্যে অতি সাধারণ বিষয় শকুন্তলার হাতে বোনা নীবার ধানের অঙ্কুরিত হওয়ার দৃশ্য পিতা কণ্বের হৃদয় হাহাকার করে উঠেছে। বিষয়টি সাধারণ হলেও প্রকৃতি থেকে বেড়ে ওঠা নরম-কোমল নীবার ধানের দৃশ্য মহাকবি কালিদাস অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন–

শমমেষ্যতি মম শোকঃ কথং নু বৎসে! ত্বয়া রচিতপূর্বম্।
উটজদ্বারবিরূঢ়ং নীবারবলিং বিলোকয়তঃ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৪/২১)

অর্থাৎ, বৎসে,তোমার পথ শুভ হোক। তবে কুটিরের দুয়ারে তুমি যে নীবার ধান বুনেছ, তা আজ অঙ্কুরিত হয়েছে। সেদিকে চেয়ে কেমন করে আমার শোক কমবে বলে যাও।

পঞ্চম অঙ্কে রাজগৃহে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যানের দৃশ্য অতি রুক্ষ পরিবেশ বিরাজ করছে। যেখানে শকুন্তলা মুখে অবগুণ্ঠনবতী হয়ে থাকলেও রাজা দুষ্যন্তের দৃষ্টিতে তাঁর রূপ-মাধুর্য বর্ণনায় প্রকৃতির কোমল স্পর্শ অনুভূত হয়। যেমন–

কা স্বিদবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৫/১৩)

অর্থাৎ, বিশীর্ণ পাতার মধ্যে কিশলয়ের মতো, ঋষিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে কে ইনি? মুখে তাঁর অবগুণ্ঠন, দেহলাবণ্য তেমন করে প্রকাশিত নয়।

বসন্ত বর্ণনা

ষষ্ঠ অঙ্কে দুষ্যন্তের স্মৃতি ভ্রষ্টের কারণে শকুন্তলার সাথে বিচ্ছেদ হয়েছে। এক জ্যোতি মূর্তি এসে শকুন্তলাকে ঊর্ধে তুলে নিয়ে গেছে। পরবর্তীতে স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে আংটি দেখার পর মনে পড়ে গেল শকুন্তলার সাথে গোপন বিবাহের কথা। তখন প্রিয়জন হারানো হৃদয় ভাঙ্গা দুঃখের মাঝেও মহাকবি কালিদাস উদ্যান পালিকাদের উক্তিতে বসন্তের প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন–

প্রথমা–
আতাম্রহরিতপাণ্ডুরজীবিত সত্যং বসন্তমাসস্য।
দৃষ্টোঽসি চূতকোরক! ঋতুমঙ্গল! ত্বাং প্রসাদয়ামি ॥ (প্রসুন, ২০১৫, ৬/২)
দ্বিতীয়া– পরভৃতিকে! কিম্ একাকিনী মন্ত্রয়সে?
প্রথমা– মধুকরিকে! চুতকলিকাং দৃষ্টা উন্মত্তা পরভৃতিকা ভবতি।
দ্বিতীয়া– কথম্ উপস্থিতঃ মধুমাসঃ।
প্রথমা– মধুকরিকে! তব ইদানীং কালঃ এষঃ মদবিভ্রমগীতানাম্।
দ্বিতীয়া– সখি! অবলম্ব্য মাং যাবৎ অগ্রপাদস্থিতা ভূত্বা চূতকলিকাং গৃহীত্বা কামদেবার্চনং করোমি।

ত্বমসি ময়া চূতাঙ্কুর! দত্তঃ কামায় গৃহীতধনুষে।
পথিকজনযুবতিলক্ষ্যঃ পঞ্চাভ্যধিকঃ শরো ভব (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৬/৩)

অর্থাৎ, আমি দেখলাম আম গাছে কিছুটা লালচে সবুজ এবং হরিৎ পাণ্ডুর রংয়ের, বসন্ত ঋতুর প্রাণস্বরূপ, হে ঋতুমঙ্গল! তোমার মুকুল ধরেছে। আমি তোমাকে বন্দনা করছি।

দ্বিতীয়া– পরভৃতিকা একা একা কী বলছিস?
প্রথমা– মধুকরিকা, আমের মুকুল দেখে পরভৃতিকা (কোকিল) উন্মত্ত হয়েছে।
দ্বিতীয়া– কী? বসন্ত কি এসে গেছে ?
প্রথমা– মধুকরিকা, এই সময় মদবিহ্বল হয়ে গান গাওয়ার বসন্তকাল উপস্থিত হয়েছে।
দ্বিতীয়া– আমি পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আমের মুকুল তুলে আনি। তারপর সেই মুকুল দিয়ে কামদেবের অর্চনা করব। ওলো, সম্পূর্ণ না ফুটলেও ছেঁড়ামাত্রই গন্ধ বেরোচ্ছে।

হে আমের মুকুল, আমি তোমাকে ধৃতধনু কামদেবকে দান করলাম। প্রোষিত-ভর্তৃকাদের লক্ষ্য করে যে পাঁচটি বাণ তিনি নিক্ষেপ করেন তার মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ বাণ হও।

সহমর্মী প্রকৃতি

ষষ্ঠ অঙ্কে রাজা দুষ্যন্ত পরিণীতা ও সন্তান সম্ভবা শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য গভীর দুঃখে ভেঙে পড়েছেন। এই মর্মবেদনা তিনি কোনো ভাবেই প্রশমিত করতে পারছেন না। বিচ্ছেদে তাঁর হৃদয় ছারখার হয়ে যাচ্ছে। মহাকবি কালিদাস এই বিষয় বর্ণনা করতে প্রকৃতিকেও দুঃখের সমান ভাগীদার করছেন। এখানে রাজার অন্তরের ব্যথা প্রকৃতিকে স্পর্শ করেছে। এভাবে নাটকে প্রকৃতি ও মানুষের প্রাণ একই সূত্রে গাঁথা। যেমন–

চূতানাং চিরনির্গতাপি কলিকা বধ্নাতি ন স্বং রজঃ
সন্নদ্ধং যদপি স্থিতং কুরবকং তৎ কোরকাবস্থয়া।
কণ্ঠেষু স্খলিতং গতেঽপি শিশিরে পুংস্কোকিলানাং রুতং
শঙ্কে সংহরতি স্মরোঽপি চকিতস্তূণার্ধকৃষ্টং শরম্ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৬/৪)

অর্থাৎ, বহু দিন আগে আমের মুকুল নির্গত হলেও তাতে পরাগ দেখা দিচ্ছে না, কুরুচি ফুল সামান্য উদ্‌গত হয়ে কুঁড়ি হয়েই রয়ে গেল। শীতকাল শেষ হলেও কোকিলদের কণ্ঠে কুহুরব শোনা যাচ্ছে না। মনে হয় ভগবান কামদেবও ভীত হয়ে তূণ থেকে অর্ধেক তোলা বাণ তূণেই রেখে দিয়েছেন।

পরবর্তীকালে রাজার দুঃখ লাঘবের জন্য চতুরিকা চিত্র অঙ্কন করে দিয়েছেন। সেই চিত্র দেখে দেখে প্রিয়তমা শকুন্তলার স্পর্শ লাভের চেষ্টা করছেন। রাজা উন্মত্ত হয়ে প্রকৃতির আবেশে পূর্বোক্ত স্মৃতি নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত করেছেন–

কার্যা সৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী
পাদাস্তামভিতো নিষণ্ণহরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ।
শাখালম্বিতবল্কলস্য চ তরোর্নির্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ

শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্ ॥
কৃতং ন কর্ণার্পিতবন্ধনং সখে শিরীষমাগণ্ডবিলম্বিকেসরম্।
ন বা শরচ্চন্দ্রমরীচিকোমলং মৃণালসূত্রং রচিতং স্তনান্তরে ॥
এষা কুসুমনিষণ্ণা তৃষিতাপি সতী ভবন্তমনুরক্তা।
প্রতিপালয়তি মধুকরী ন খলু মধু বিনা ত্বয়া পিবতি ॥
অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়ং
পীতং ময়া সদয়মেব রতোৎসবেষু।
বিম্বাধরং স্পৃশসি চেদ্ ভ্রমর! প্রিয়ায়া-
স্ত্বাং কারয়ামি কমলোদরবন্ধনস্থম্ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৬/১৭–২০)

অর্থাৎ, মালিনী নদী আঁকতে হবে, যার তটভূমিতে হংসমিথুন লীন হয়ে আছে, এর সামনেই যেখানে হরিণগুলো বসেছিল সেই প্রকাণ্ড পর্বতগুলোও আঁকতে হবে। এমন একটা গাছ আঁকতে চাই যার শাখায় ঋষিদের বল্কল প্রলম্বিত, আর তারই নিচে আঁকতে হবে এমন একটি হরিণ যে বাম নয়ন কণ্ডূয়ন কাছে একটি কালো হরিণের শিং। বন্ধু, শিরীষফুলটি আঁকা হয়নি, যার বৃন্তটি তাঁর কানে গোঁজা আর যার কেশরটি গাল পর্যন্ত বিস্তৃত। আর দুই স্তনের মাঝখানে শরৎকালের চন্দ্রকিরণের মতো কোমল মৃণালসূত্রও আঁকা হয়নি। ওগো কুসুমলতার প্রিয় অতিথি, এখানে ঘুরে কেন অনর্থক কষ্ট পাচ্ছ, দেখ– তোমার অনুরাগিণী সখী মধুকরী ফুলে বসে আছে, তৃষ্ণার্ত হয়েও অপেক্ষা করছে, তুমি ছাড়া (একাকিনী) সে মধু পান করবে না। তাই তো দেখছি। আমার আদেশ শুনছিস না? তবে শোন-অম্লান নব কিশলয়ের মতো প্রিয়ার যে লোভনীয় বিম্বাধর সুরতোৎসবে আমি পান করেছি, হে ভ্রমর! তুই যদি তা স্পর্শ করিস তাহলে তোকে পদ্মোদ্বা? বন্ধ করে রাখব।

সপ্তম অঙ্কের শুরুতে রাজা অগ্নিমিত্র ও ইন্দ্রের সারথি মাতলির আলাপচারিতায় প্রকৃতি-পরিবেশের বিভিন্ন বিষয় প্রকাশিত হয়েছে। যেমন–

অন্তর্গতপ্রার্থনমন্তিকস্থং
জয়ন্তমুদ্বীক্ষ্য কৃতস্মিতেন।
আমৃষ্টবক্ষোহরিচন্দনাঙ্কা
মন্দারমালা হরিণা পিনদ্ধা ॥
সিধ্যন্তি কর্মসু মহৎস্বপি যন্নিযোজ্যাঃ
সম্ভাবনাগুণমবেহি তমীশ্বরাণাম্।
কিং বাহ্ভবিষ্যদরুণস্তমসাং বিভেত্তা
তং চেৎ সহস্রকিরণো ধুরি নাকরিষ্যৎ ॥
বিচ্ছিত্তিশেষৈঃ সুরসুন্দরীণাং

বর্ণৈরমী কল্প-লতাংশুকেষু।
বিচিন্ত্য গীতক্ষমমর্থজাতং
দিবৌকসস্ত্বচ্চরিতং লিখন্তি (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৭/২, ৪, ৫)

অর্থাৎ, ইন্দ্র একটু হেসে নিজের বুকে-দোলানো হরিচন্দনে-চর্চিত মন্দার মালাটি খুলে নিয়ে পরিয়ে দিলেন। যদি অরুণকে সম্মুখে না রাখতেন তাহলে তিনি কি অন্ধকার দূর করতে পারতেন? অঙ্গরাগের বিশিষ্ট বর্ণ দিয়ে কল্পলতার বসনে আপনার চরিতকথা লিখেছেন।

প্রকৃতির সাযুজ্যে বায়ুমণ্ডলের বর্ণনা

রাজা দুষ্যন্ত ইন্দ্রের সারথি মাতলিসহ মহারাজ ইন্দ্রের শত্রুকে পরাজিত করে স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝামাঝি স্থানে মারীচির আশ্রমে যাওয়ার পথে বায়ুমণ্ডলের বায়ুর প্রবাহ ও নক্ষত্র মণ্ডলের বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হওয়ার বিষয় মহাকবি কালিদাস এখানে উল্লেখ করেছেন–

ত্রিস্রোতসং বহতি যো গগনপ্রতিষ্ঠাং
জ্যোতীংষি বর্তয়তি চ প্রবিভক্তরশ্মিঃ।
তস্য ব্যপেতরজসঃ প্রবহস্য বায়ো-
র্মার্গো দ্বিতীয়হরিবিক্রমপূত এষঃ ॥
অয়মরবিবরেভ্যশ্চাতকৈর্নিষ্পতদ্ভি-
র্হরিভিরচিরভাসাং তেজসা চানুলিপ্তৈঃ।
গতমুপরি ঘনানাং বারিগর্ভোদরাণাং
পিশুনয়তি রথস্তে সীকরক্লিন্ননেমিঃ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৭/৬–৭)

অর্থাৎ, এখানে বায়ুর ত্রিপথগামিনী গঙ্গাকে আকাশপথে ধারণ করে রেখেছে, জ্যোতিষ্কসমূহের রশ্মিধারাকে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করে আবর্তিত রয়েছে, বামনরূপী বিষ্ণুর দ্বিতীয় পাদবিক্ষেপের কারণে স্থানটি পবিত্র রজোগুণহীন। রথের চাকা মেঝের জলকণায় ভিজে আছে। চাকার শলাকাগুলোর ফাঁক দিয়ে চাতক পাখিরা আসা-যাওয়া করছে। বিদ্যুতের আলোয় রথের ঘোড়াগুলো আলোকিত হয়েছে, এসব বলে দিচ্ছে আমরা এখন জলভরা মেঘের ওপর দিয়ে চলছি।

শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জতাং মেদিনী
পর্ণস্বান্তরলীনতাং বিজহতি স্কন্ধোদয়ৎ পাদপাঃ।
সন্তানৈস্তনুভাবনষ্টসলিলা ব্যক্তিং ভজন্ত্যাপগাঃ
কেনাপ্যুৎক্ষিপতেব পশ্য ভুবনং মৎপার্শ্বমানীয়তে (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৭/৮)

অর্থাৎ, মাতলি দেখুন অতি বেগে অবতরণ করায় পৃথিবীকে আশ্চর্য দেখাচ্ছে। পাহাড়গুলো যেন উঁচুর দিকে আসছে আর তাদের চূড়া থেকে পৃথিবী যেন নিচে নামছে। গাছগুলোর মূল ও কাণ্ড দেখা যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তারা যেন পত্রপুঞ্জ থেকে বেরিয়ে পড়েছে। আর ক্ষীণতার জন্যে যেসব নদীর জল ছিল অদৃশ্য তা এখন কাছে আসায় আবার বিস্তৃত রূপ নিয়ে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন সমগ্র পৃথিবীকে উঁচু দিকে ছুড়ে আমার পাশে আনছে।

হেমকূট পর্বতের বর্ণনা

স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝামাঝি অবস্থিত হেমকূট পর্বত। এই স্থান প্রকৃতির সৌন্দর্যের অপার লীলাভূমি, তপস্বীদের পরম সাধনার ক্ষেত্র। এখানে মহর্ষি মারীচের আশ্রমের তপোবনের পশুও ভালোবাসার আবেশে হিংসা ভুলে প্রতিদানে মানুষের সাথে সৌহৃদ্য প্রকাশ করছে। নাটকে হস্তিনাপুরের রাজা দুষ্যন্ত স্বর্গ থেকে অবতরণের পথে এই পর্বতটি দেখতে পান। তাঁর মতে– স্বর্গাদিদমধিকতরং বির্বৃতি-স্থানম্। অমৃতহ্রদবিাবগাঢ়েছস্মি। (প্রসূন, ১৯৮৩) অর্থাৎ, জায়গাটি স্বর্গের চেয়েও সুখের অমৃত সাগরে যেন ডুব দিয়েছি। মহাকবি কালিদাস রাজা দুষ্যন্ত ও মাতলির কথোপকথনে নিম্নোক্তভাবে আরও প্রাকৃতিক বর্ণিল দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। যেমন–

> পূর্বপরসমুদ্রাবগাঢ়ঃ কনকরসনিস্যন্দী সান্ধ্য ইব মেঘপরিধিঃ সানুমানলোক্যতে।
> উপোঢ়শব্দা ন রথাঙ্গনেময়ঃ প্রবর্তমানং ন চ দৃশ্যতে রজঃ।
> অভুতলস্পর্শতয়া নিরুদ্ধতস্তবাবতীর্ণেছপি রথো ন লক্ষ্যতে ॥
> বল্মীকার্ধনিমগ্নমূর্তিরুরসা সন্দষ্টসর্পত্বচা
> কণ্ঠে জীর্ণ-লতা-প্রতান-বলয়েনাত্যর্থ সংপীড়িতঃ।
> অংসব্যাপি শকুন্তনীড়নিচিতং বিভ্রজ্জটামণ্ডলং
> যত্র স্থানুরিবাচলো মুনরসাবভ্যর্কবিশ্বং স্থিতঃ ॥
> প্রাণানামনিলেন বৃত্তিরুচিতা সৎকল্পবৃক্ষে বনে
> তোয়ে কাঞ্চনপদ্মরেণুকপিশে ধর্মাভিষেকক্রিয়া।
> ধ্যানং রত্নশিলাতলেষু বিবুধস্ত্রীসন্নিধৌ সংযমো
> যৎ কাঙ্ক্ষন্তি তপোভিরন্যমুনয়স্তস্মিংস্তপস্যন্ত্যমী (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৭/১০–১২)

অর্থাৎ, এই যেখানে সেই ঋষি রয়েছেন বল্মীকি যাঁর দেহ অর্ধনিমগ্ন, সাপের চামড়ায় যাঁর বক্ষদেশ আলিঙ্গিত, জীর্ণ লতাপত্র বলয়ে যাঁর কণ্ঠ বেষ্টিত, বিহঙ্গনীড়ে যাঁর স্কন্ধ আকীর্ণ, জটামণ্ডলধারী যিনি স্থাণুর মতো স্থির, সূর্যমণ্ডলে যাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। আমি বিস্ময় নিয়ে দেখছি। কারণ– কল্পতরু বনে এরা শুধু বায়ুভক্ষণে জীবন-যাপন করেন, পদ্মরেণু-পিঙ্গল জলে এরা পূণ্যস্নান করেন, রত্নশিলাগৃহে এরা ধ্যান করেন, সুরাঙ্গনাদের সান্নিধ্যে থেকেও এরা সংযমী,

অন্য মুনি তপোবলে যে সব চেয়ে থাকেন (তার প্রতি উদাসীন হয়ে) তার মধ্যেই এরা তপস্যা করছেন।

ভরতবাক্যে প্রকৃতি অনুষঙ্গ

সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন নাটকে ভরতবাক্যে সাধারণত স্রষ্টার উদ্দেশ্যে স্তুতি করা হয়ছে। কিন্তু মহাকবি কালিদাসের এই নাটকে দেখা যায়, প্রকৃতিকে রক্ষার নিমিত্তে বৃষ্টির জন্য ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। যেমন –

> রথেনানুদ্ঘাতস্তিমিতগতিনা তীর্ণজলধিঃ
> পুরা সপ্তদ্বীপাং জয়তি বসুধামপ্রতিরথঃ।
> ইহায়ং সত্ত্বানাং প্রসভদমনাৎ সর্বদমনঃ
> পুনর্যাস্যত্যাখ্যাং ভরত ইতি লোকস্য ভরণাৎ (প্রসুন, ২০১৫, পৃ. ৭/৩৩)

অর্থাৎ, তোমাদের প্রজাদের মধ্যে ইন্দ্র প্রচুর বৃষ্টিদান করে বসুন্ধরাকে রক্ষা করুন। ব্যাপক যজ্ঞসম্পাদনে দেবতাদের তুষ্ট করুন। এইভাবে শত যুগ ধরে উভয় লোকের প্রশংসনীয় পারস্পরিক কর্তব্য পালন করে বিজয়ী হোন।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, সংস্কৃত সাহিত্যের কবি-সাহিত্যিক ও নাট্যকারদের মধ্যে যিনি প্রকৃতি নিয়ে বেশি লেখালেখি করেছেন, প্রকৃতিকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন এবং প্রকৃতিকে ভালোবাসার কথা বলেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম মহাকবি কালিদাস। এজন্য তাঁকে প্রকৃতির কবিরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব যুগে তিনি আবির্ভূত হয়ে যেভাবে প্রকৃতিতে লালন-পালনের কথা তথা রক্ষা করার কথা বলেছেন, এমনটি অন্য কোনো লেখকের সাহিত্যকর্মে দেখা যায় না। নাটকের শুরুতে প্রকৃতির ও পরিবেশের প্রধান অবলম্বন মাটি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য– এই আটটি উপাদানকে স্রষ্টার মূর্তিরূপে বন্দনা করা হয়েছে। অত্যন্ত নিপুণভাবে নাটকের কাহিনির মধ্যে তপোবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনার পাশাপাশি বনের প্রাণীদের রক্ষার জন্য বিনীত আবেদন জানানো হয়েছে। তখনকার দিনে মৃগয়া তথা বন্য প্রাণী শিকারের প্রচলন ছিল। সেই রাজ্যের রাজা স্বয়ং মৃগয়ায় গিয়েছিলেন। রাজার এই শিকার প্রবণতা প্রকৃতির প্রতি মানুষের আগ্রাসী মনোভাবের পরিচয় দেয়। মহাকবি কালিদাস তাপসদের উক্তির মাধ্যমে এই রাজাকে প্রাণী হত্যা করতে নিষেধ জানিয়েছেন। পরবর্তীকালে বন্য প্রাণী রক্ষা এবং ভালোবাসার কথা বলেছেন। তবে শুধু বন্য প্রাণী নয়, লতা-পাতা বৃক্ষাদিকেও

মানুষের মতো সমধর্মী মনে করে ভালোবাসা ও যত্ন নেওয়ার কথা বলেছেন। এখানে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র প্রধানদের বন-বনানী রক্ষার দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। নাটকের প্রধান চরিত্র নায়িকা শকুন্তলার প্রকৃতির প্রতি অগাধ ভালোবাসা লক্ষ করা যায়, যেখানে তিনি বৃক্ষাদি-তরুলতাকে জলসিঞ্চন না করে, প্রাণিদের খাবার না দিয়ে নিজে খাবার গ্রহণ করতেন না। তিনি প্রকৃতিকে বন্ধু-সখা মায়ের মতো মনে করে পতিগৃহে যাবার সময়ে তাদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে চোখের জলে বিদায় নিয়েছেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে সখীদের সেসকলের যত্ন নেওয়ার কথা বলেছেন। তপস্বীদের পূজার উপকরণ প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করা, প্রেম-সন্তপ্ত শকুন্তলার শুশ্রূষায় প্রকৃতির ওষধি ব্যবহার করা, মনের দুঃখ নিরাময়ে প্রকৃতির সান্নিধ্যে গিয়ে সান্ত্বনা খোঁজা, প্রকৃতিতে মানুষের সুখ-দুঃখের সহমর্মী করা, মোহনীয়ভাবে বায়ুমণ্ডলের বর্ণনা, সিংহ শাবকেরও মানুষের প্রতি হিংসা ভুলে যাওয়া, নাটকের সর্বশেষে ভরতবাক্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় প্রকৃতির অনুষঙ্গ হিসেবে ধরণীকে শস্য-শ্যামলে পরিপূর্ণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এমনিভাবে কালিদাস যেখানে খ্রি. পূ. যুগে বন-বনানী রক্ষার প্রয়াস নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে বর্তমান সময়েও দেখা যায়, মানুষ বন-বনানী, গাছ-পালা, তৃণ-লতাদি মনের খেয়ালে ধ্বংস করছে। সেই সাথে সরকারি নানা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্বিচারে বনজ সম্পদ নষ্ট করছে। এগুলো কখনও কাম্য নয়। এগুলো যে মানুষের বেঁচে থাকার মূল অবলম্বন তা অনেকের চিন্তায় আসে না। বিশেষ করে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে গৃহীত নানা পদক্ষেপ, বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠনের আন্দোলনের মাধ্যমে সচেতন করা, জাতীয় পরিবেশ দিবসের ভূমিকা প্রভৃতি প্রচেষ্টার মাধ্যমে সকলকে পরিবেশ রক্ষায় আন্তরিকভাবে মনোযোগী হতে হবে। মহাকবি কালিদাস খ্রিষ্টপূর্ব যুগে নাটকের মাধ্যমে প্রকৃতি ও পরিবেশের যত্ন নেওয়ার বিষয়গুলো অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আলোকপাত করেছেন। তিনি প্রকৃতিকে মানব চরিত্রের মতো সহমর্মী করে কালজয়ী শাশ্বত আবেদন সৃষ্টি করেছেন। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেমের চেয়েও প্রকৃতি প্রেম এখানে স্বর্গীয় ও চির উপভোগ্য হয়েছে। কেননা নাটকের প্রধান চরিত্র নায়িকা শকুন্তলা তপোবনে প্রকৃতির সান্নিধ্যে আজন্মে লালিত হয়েছে স্বামী গৃহে যাবে বলে গাছ-পালা-পশু-পাখির সাথে নিত্যদিনের যে সম্পর্ক ছিল, সে সম্পর্ক ছিন্ন হতে চলছে। এ যে কি কষ্ট! তা বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর অনুপস্থিতিতে সেসবের যত্ন নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে তপোবনে লালিত প্রকৃতির অনুষঙ্গগুলো দেখে দেখে সখীদের এবং পিতা কণ্বের মনে যে গভীর হাহাকার তা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষ ও প্রকৃতির সাথে এতটা ভালোবাসার সেতুবন্ধন– যা সত্যিই শাশ্বত-স্বর্গীয়। এখানে প্রকৃতির সান্নিধ্যে মানুষের সাথে মিলনের বাঁশি বেজেছে তেমনি নগরের কৃত্রিমতা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছে। তাই *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকের প্রকৃতি ও পরিবেশের বাস্তব বিষয়গুলো দ্বারা মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে মানবসভ্যতা ও ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার অনুপ্রেরণা লাভ করবে।

সহায়কপঞ্জি

অনিলচন্দ্র বসু। (২০১৭)। *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্*। সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ব্যাস, রাজ শেখর বসু [অনুদিত] (১৪২২)। *মহাভারত*। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

গোপালচন্দ্র মিশ্র। (২০১৩)। *সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা ঃ বিবিধ প্রসঙ্গ*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, বিধান সরণী, কলিকাতা।

দেবকুমার দাস। (১৪০৪)। *সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, বিধান সরণী, কলিকাতা।

ধীরেন্দ্রনাথ, বন্দ্যোপাধ্যায়। (২০১২)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।

নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস। (১৯৮৫)। *কালিদাসের শকুন্তলা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

প্রসূন বসু, [সম্পা.] (১৯৮৩)। *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার ১৫দশ খণ্ড*। নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ।

বিমান ভট্টাচার্য। (২০০৪)। *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা*। বুক ওয়ার্ল্ড, কলকাতা, ষোড়শ মুদ্রণ।

রঞ্জিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাস দে [সম্পা.] (২০০৯)। *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ সহায়িকা*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

রাজ শেখর বসু [সম্পা.] (১৩৯৬)। *রামায়ণ*। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

রামেশ্বর শ। (বা. ১৪১১)। *সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য সমাজচেতনা ও মূল্যায়ন*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী [সম্পা.] (২০০৮)। *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

যুধিষ্ঠির গোপ। (২০১৭)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*। সংস্কৃত বুক ডিপো, কলিকাতা।

Ghosal, S. N. (1971)। *Kālidāsa : An Estimate of his Literary Merit* | Calcutta World Press, Calcutta.

Keith, A. Berriedale (1964)। *The Sanskrit Drama in its Origin, Development | Theory & Practice*, Oxford University Press, Oxford.

Macdonell, Arthur A. (1900)। *A History of Sanskrit Literature*, | D. Appleton and Company, New York.

Mandal, Paresh Chandra (1971)। *Kālidāsa as a Dramatist – a Study* | University of Dhaka, Dhaka, 1986.